স্বস্তিকা

দাম : ষোলো টাকা

৭৬ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।। ১ জুলাই, ২০২৪।। ১৬ আষাঢ়, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। শ্যামাপ্রসাদ বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

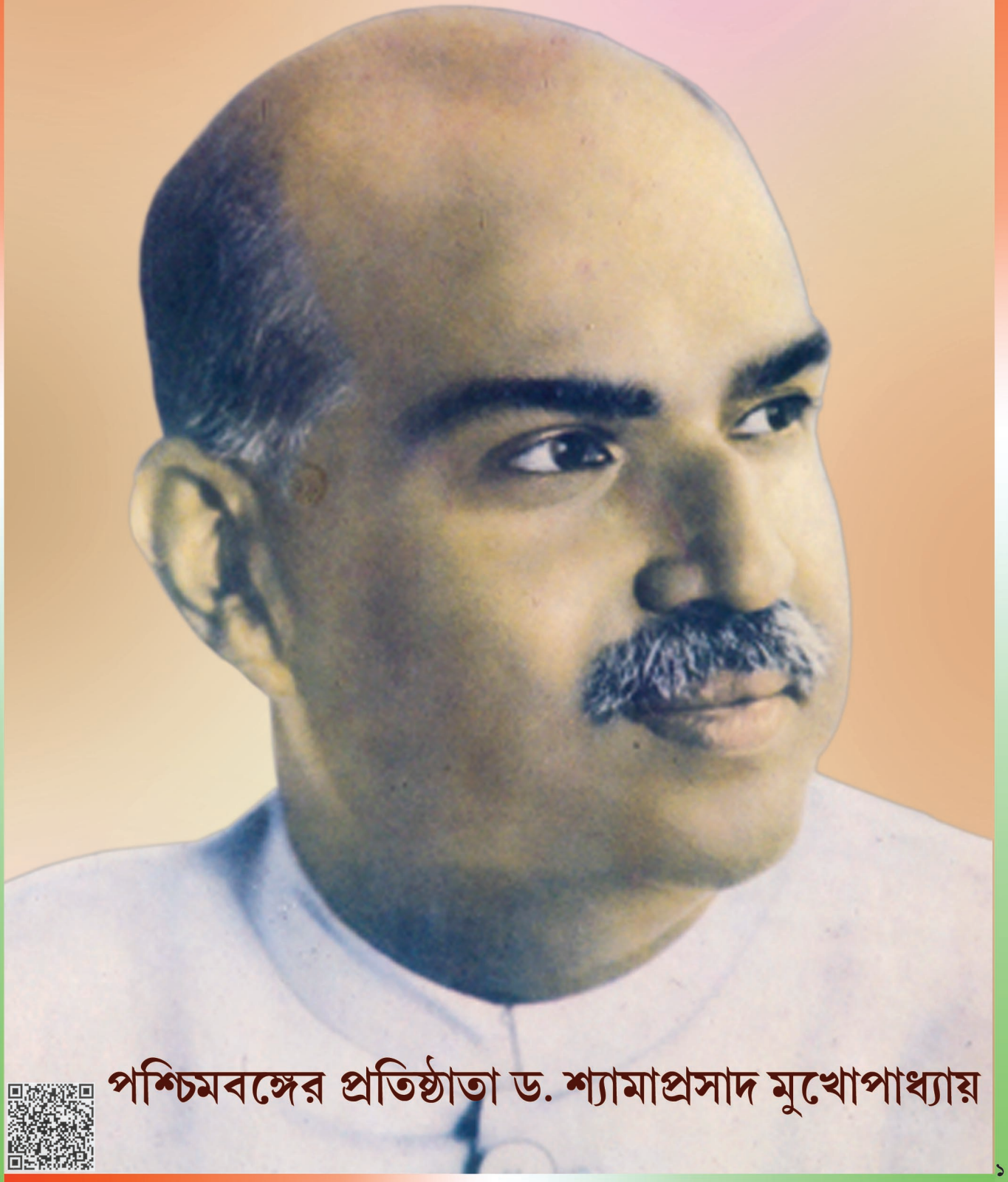

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

৭৬ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ১৬ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১ জুলাই - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

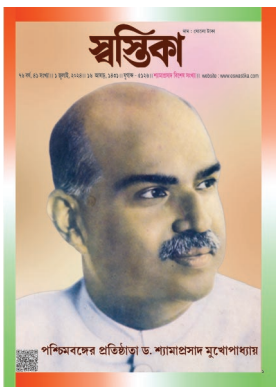

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

বিজেপির থেকে আড়াই গুণ কম ভোট পেয়েও রাহুল গান্ধীর নৃত্যনাট্য ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

দিদি কিন্তু ধোয়া তুলসীপাতা ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

অসম জুড়ে দীর্ঘায়িত হচ্ছে ইসলামি ছায়া

☐ উপমন্যু হাজারিকা ☐ ৮

বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হতে চলেছে : এ দায় কে নেবে?

☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ১১

কংগ্রেস ও বামপন্থী নির্বাচনী আঁতাত তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

☐ অমিত কুমার চৌধুরী ☐ ১৪

শিক্ষাব্রতী ড. শ্যামাপ্রসাদ ☐ ড. দিবাকর কুণ্ডু ☐ ১৭

'ওই টাকমাথা ভদ্রলোক কে যেন?'

☐ তথাগত রায় ☐ ১৯

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

☐ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ২৩

ত্রাণ ও সেবাকর্মে শ্যামাপ্রসাদ ☐ কল্যাণ গৌতম ☐ ৩১

সত্যে অবিচল ছিলেন যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

☐ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ☐ ৩৫

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছে বাঙ্গালি ☐

কানু রঞ্জন দেবনাথ ☐ ৪৩

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা

☐ গিরিরাজ দে ☐ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

সংবাদ প্রতিবেদন : ১০ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৫-২৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে ৮ জুলাই, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৮ জুলাই, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জগন্নাথের রথযাত্রা

যিনি জগতের নাথ তিনিই জগন্নাথ। তাঁরই রথযাত্রা আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এখন দেশের সীমা অতিক্রম করে জগৎজুড়ে রথ চলছে। ভারতবিখ্যাত পুরীর রথযাত্রা। বঙ্গপ্রদেশে মাহেশের রথযাত্রা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রথ। কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্ঘের উদ্যোগে বিশ্বের একশোর বেশি দেশে পালিত হচ্ছে রথযাত্রা। রথযাত্রার বিশ্বায়ন ঘটেছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় রথযাত্রা বিষয়ে আলোকপাত করবেন উজ্জ্বল মণ্ডল, বিমলকৃষ্ণ দাস, প্রদীপ মারিক, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

চিরভাস্বর শ্যামাপ্রসাদ

মুসলিম লিগের গুন্ডাগিরির নিকট কংগ্রেস নতজানু হইয়া দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগ মানিয়া লইলে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ভারত বিভাগ ঘোষণা করেন। ঘোষণা মতো বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হইয়াছিল। ইহার প্রতিবাদে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু প্রতিনিধিদের লইয়া একটি প্রস্তাবে দাবি করেন যে, হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলিকে লইয়া একটি পৃথক রাজ্য গঠন করিয়া ভারতভুক্তি করা হউক। তাঁহার এই প্রস্তাবে বঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন, ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার,ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, লর্ড সিনহা, হেমেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ অকুণ্ঠ সমর্থন জানান শ্যামাপ্রসাদকে। ইহার পরই শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গ জুড়িয়া এক ব্যাপক জন-আন্দোলন সংগঠিত করেন। ইহাতেই ভীত হওয়া জিন্নার অঙ্গুলিহেলনে বঙ্গেরই কতিপয় ব্যক্তিত্ব স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গের দাবি উত্থাপন করিয়া বসেন। দূরদর্শী শ্যামাপ্রসাদ জিন্নার এই চাতুরী ধরিয়া ফেলেন। স্বাধীন বঙ্গ অর্থাৎ প্রকারান্তরে সমগ্র বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিবার অভিপ্রায়। শ্যামাপ্রসাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্দোলনের ফলে বঙ্গপ্রদেশের সুশীল সমাজ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এই সত্য অনুধাবন করিয়া বঙ্গ বিভাজনের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে ৫৮ : ২১ ভোটে হিন্দুপ্রধান এলাকা লইয়া পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হয়।

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে যে ৫৮ জন প্রতিনিধি ভোট দিয়াছিলেন তাহাদের নাম বর্তমান প্রজন্মের জানা প্রয়োজন। তাঁহারা হইলেন, সর্বশ্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনী মোহন বর্মন, হেমন্ত কুমার বসু, জ্যোতি বসু, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, সতীশচন্দ্র বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, কুমারী বীণা দাস, রাধানাথ দাস, উদয়চাঁদ মহতাব, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, বিষাপতি মাঝি, ভূপতি মজুমদার, ঈশ্বরচন্দ্র মাল, আশুতোষ মল্লিক, অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল, বঙ্কুবিহারী মণ্ডল, কৃষ্ণ প্রসাদ মণ্ডল, ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি, কালীপদ মুখার্জি, মুকুন্দবিহারী মল্লিক, বাসন্তীলাল মুরারকা, খগেন্দ্রলাল দাসগুপ্ত, কানাইলাল দাস, কানাইলাল দে, হরেন্দ্রনাথ দলুই, সুকুমার দত্ত, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, অরবিন্দ গয়েশ, এ.কে. ঘোষ, বিমল কুমার ঘোষ, ডি. গোমস, ডম্বর সিং গুরুং, ঈশ্বরদাস জালান, দেবীপ্রসাদ খৈতান, চারুচন্দ্র মোহান্তি, অর্ধেন্দুশেখর নস্কর, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, এল আর পেন্টনি, আর ই প্লেটেল, আনন্দীলাল পোদ্দার, রজনীকান্ত প্রামাণিক, কমলকৃষ্ণ রায়, যোগেশ্বর রায়, শ্রীমতী ই এম রিকেটস, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বিমলচন্দ্র সিংহ, জিসিডি উইলকস্। এঁদের নিকট বাঙ্গালি হিন্দু চিরকাল ঋণী থাকিবেন, কারণ তাঁহাদের জন্যই বাঙ্গালি হিন্দু তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার ভূমিখণ্ড পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গ রাজ্যটি পাইয়াছেন।

বাঙ্গালি হিন্দুর দুর্ভাগ্য হইল, এই ৫৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহারা ৩৪ বৎসর পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতা ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু একটি বারের জন্যও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন নাই। বরং তাহারা শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক অভিধায় ভূষিত করিয়াছেন। শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে বাঙ্গালি হিন্দুর জনমানসে বিরূপ ধারণা নির্মাণ করিয়াছেন। অবশ্য কমিউনিস্টদের চরিত্রই এইরূপ। তাহাদের ইতিহাস হইল দ্বিচারিতা ও দেশদ্রোহিতার। তাহার কারণেই তাহারা নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে। বহু পূর্বেই ড. শ্যামাপ্রসাদকে চিনিয়াছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তথা হিন্দু মিলন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। তিনিই আশীর্বাদ করিয়া শ্যামাপ্রসাদকে বাঙ্গালি হিন্দুর নেতা নির্বাচন করিয়া গিয়াছেন। দেশভাগের কারণে ছিন্নমূল হিন্দুদের পার্শ্বে তিনি পরিত্রাতা রূপে দাঁড়াইয়াছেন। দেশ তথা হিন্দুর স্বার্থের কথা ভাবিয়া তিনি শিক্ষাঙ্গন ছাড়িয়া রাজনীতিতে পদার্পণ করিয়াছেন। মূল্যবোধের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্রবুদ্ধির রাজনীতিকদের তাহা সহ্য হয় নাই। চক্রান্তের শিকার হইয়া অকালে তাঁহাকে চিরবিদায় লইতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত দল বর্তমানে তাঁহার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিয়া চলিয়াছে। আজ হিন্দু বাঙ্গালি তথা ভারতবাসী শ্যামাপ্রসাদের আদর্শে উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত। ভণ্ড, স্বার্থান্বেষী, দেশদ্রোহী রাজনীতিকদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া শ্যামাপ্রসাদ দেশবাসীর হৃদয়ে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছেন।

সুভাষিতম্

স জীবতি গুণা যস্য ধর্মো যস্য স জীবতি।
গুণধর্মবিহীনস্য জীবনং নিষ্প্রয়ো জনম্।।

যার গুণ আছে, সেই বেঁচে থাকে। গুণহীন ও ধর্মহীন ব্যক্তির জীবন সমাজের কাছে প্রয়োজনহীন।

বিজেপির থেকে আড়াই গুণ কম ভোট পেয়েও রাহুল গান্ধীর নৃত্যনাট্য

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

দশবার সাংসদ ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। সপ্তমবারে প্রধানমন্ত্রী হন। নেহরুর মতো নরেন্দ্র মোদীও সাংসদ হয়েই প্রধানমন্ত্রী হন। রাজীব গান্ধীও তাই। নরেন্দ্র মোদী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আবার বিধায়ক হয়েই মুখ্যমন্ত্রী হন। সংসদে মমতা বিরোধী আসনে বসেছেন। একদা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তা নরেন্দ্র মোদী দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলে কারান্তরালে গিয়েছেন। কারাবন্দি জীবনও তাঁকে দমাতে পারেনি। ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করে চলা নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ ১৯৮৭ সালে। পেলেন গুজরাট রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। কেন্দ্রে তখন রাজীব গান্ধীর শাসন। নিজের কর্মকুশলতায় ও দক্ষতায় সোমনাথ মন্দির থেকে অযোধ্যা রথযাত্রা এবং কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর যাত্রার আয়োজন করেন নরেন্দ্র মোদী। রথযাত্রার নেতৃত্বে ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবাণী এবং সমগ্র রথযাত্রাটির আয়োজন, সঞ্চালনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নরেন্দ্র মোদী।

১৯৯৫ সালে গুজরাটে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। কিন্তু কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় তখনও নয়। বিরোধী দলের একজন কার্যকর্তা হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর যাত্রা হয়ে চলে আরও দীর্ঘ। বিজেপির ন্যাশনাল সেক্রেটারির দায়িত্ব পেলেন তিনি। এরপর ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত জাতীয় স্তরে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন)-এর দায়িত্ব সামলেছেন। সেই সময়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। এরপর ২০০১ সালে হন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী দলের একজন সাধারণ কার্যকর্তা হিসেবে পথ চলা শুরু করে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আপোশহীন, নিরন্তর রাজনৈতিক লড়াইয়ের পথে চলে নিজস্ব সাংগঠনিক দক্ষতায় রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে স্থাপন করেছেন একটি অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। এর বিপ্রতীপে— দেশের চূড়ান্ত পদটি পাওয়ার আগে বিরোধী আসনে বসার ভাগ্য নেহরু বা রাজীবের হয়নি। সংসদীয় রাজনীতিতে কেবল ট্রেজারি বেঞ্চে থাকা একটা বড়ো খামতি। তাতে গণতান্ত্রিক অগ্নিশুদ্ধি হয় না। বিরোধী আসন গণতন্ত্রের মন্ত্রপীঠ। আইনসভার মাহাত্ম্য তাকে নিয়েই। বিরোধীশূন্য সংসদ গণতন্ত্রে বেমানান। তার অর্থ এই নয় যে লড়াই করে হারতে হবে বা লড়তে হবে হারার জন্য। কিন্তু হেরে গেলে বিরোধী আসনে বসার মানসিকতাটাই জরুরি।

নেহরু, ইন্দিরা আর রাজীবের রেখে যাওয়া ভুলের খেসারত এখনও দেশ ও দেশের মানুষ দিচ্ছে। মমতা মুখ্যমন্ত্রী থাকায় রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ অখুশি। এই ভোটে গোটা দেশে মোদীজীর দল পেয়েছে ৩৬ শতাংশ ভোট। আর মমতাকে রাজ্যের ৫৫ শতাংশ ভোটার প্রত্যাখ্যান করেছেন। সারা দেশে বিজেপির ১ শতাংশ আর পশ্চিমবঙ্গে (গত বিধানসভার নিরিখে) মমতার ৩ শতাংশ ভোট কমেছে। 'চড়ুইকে তুই কালো রঙে ডুবিয়ে নিলি নয়। তার পায়ে ধরে সাধিলেও কোকিল সে কি হয়?'

কোনো রাজনীতি না করেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন রাজীব। অযোধ্যার বিতর্কিত সৌধের তালা খুলে দিলেও, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরোধিতা করে অসহায় মুসলমান নারীদের খোরপোষ বন্ধ করতে বিল পাশ করেন। ৪০০ পার করা কংগ্রেস ১৯৭-তে নেমে যায়। রাজীব গান্ধী বিরোধী আসনে বসেন। ১৯৮৪-র পর কংগ্রেস কোনো নির্বাচন জেতেনি। জোট সরকার চালিয়েছে। বিজেপিও দীর্ঘদিন বিরোধী আসনে থাকার পর জোট সরকার চালিয়েছে। দল গঠনের ৩৪ বছর পর তারা একক সরকার গড়ে।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র ভারতের এটাই সৌন্দর্য। স্বৈরাচারী বিদেশি কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর নামকাওয়াস্তের জোট সরকার চালাত। বিরোধিতা বরদাস্ত না করে 'আমরা-ওরা'র ডান্ডা মারত আর 'নখের যোগ্য' কারা তা নির্ধারণ করত। ২৩৫ থেকে ৪০ আসনে নেমে ধ্বংস হয়ে যায়। লোক হাসাতে জ্যোতি বসু বলতেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আর সর্ববৃহৎ বাম জোট।

জামিনে থাকা পুলিশ কর্তা রাজীব কুমারকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুলিশ অফিসার বলেন মমতা। বাম-কংগ্রেস আর মমতা একসঙ্গে মোদীজীকে স্বৈরাচারী বলে। তারা শুনতে পান না যে আস্তাবলের ঘোড়াগুলো হাসছে। পরে ইউপিএ সরকারে তৃণমূলের ৬ জনকে রাষ্ট্রমন্ত্রী করেছিলেন মমতা। দীনেশ ত্রিবেদী আর মুকুল রায়কে কেন্দ্রে পূর্ণমন্ত্রী বানিয়েও ঘাড় ধাক্কা দেন। প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিকে বাদ দিলে এ রাজ্য থেকে হয়তো মমতাই কেন্দ্রে শেষ পূর্ণমন্ত্রী।

মমতা, রাহুল আর সীতারামরা আসন সংখ্যার বিচারে মোদীজীর পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে দাম্ভিকতা দেখেন। বাস্তবে 'দাম্ভিকতা'র প্রসঙ্গ উঠলেই সেই রাজীব, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আর মমতার মুখই ভেসে ওঠে। বিরোধী আসনে না বসলে কি রাজনৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না? কমিউনিস্টরা বিরোধী আসনে বসেও স্বৈরাচারী শাসক হয়ে উঠেছিল। সাড়ে ২৩ বছরের প্রশাসক জীবনে সাড়ে তেরো বছর মুখ্যমন্ত্রী আর দশ বছর প্রধানমন্ত্রী মোদীজী। অসাধারণ এই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এই মুহূর্তে ভারতের কোনো নেতার নেই। বিজেপির থেকে আড়াই গুণ কম ভোট পেয়ে রাহুল গান্ধী নৃত্যনাট্য করছেন। অনেকে তাঁকে 'জোকার বালক' বা 'বালক রাহুল' বলছেন।

৫৪ বছর বয়সি এই বালকের পিতার ঘরে বেড়ে ওঠা বর্তমানে ইন্ডিজোটের ছোটো শরিক মমতা কিন্তু অনেক সন্তর্পণ। তাঁর লীলা আবার বোঝা দায়! রাহুলের যা রাজনৈতিক বুদ্ধি তাতে আরও কয়েকটি ভোটে বিরোধী আসনে থেকে গেলেই তাঁর মঙ্গল। তার পিতার মতো ভুল করবেন না হয়তো। রাহুলের জন্য ২০২৪-এর ফল ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে। মমতা ভালোই জানেন বিজেপির বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে তিনি খুব একটা এগিয়ে নেই। পরের হাফ ২০২৬-এর রাজ্য ফাইনাল। সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী আসনে না বসার বা প্রত্যক্ষ ভাবে বিরোধী রাজনীতি না করার অভিজ্ঞতা চড়ুইকে কোকিলের স্থান আর কাককে ময়ূরপুচ্ছ দেওয়ার শামিল। মমতা সুবিধামতো কানে দেখেন আর চোখে শোনেন। রাহুল তা পারবেন না বলেই চিরকাল বিরোধী আসনেই থেকে যাবেন। হয়তো শাসক কোনোদিন হবেন না। □

দিদি কিন্তু ধোয়া তুলসীপাতা

সুঅভিনেত্রীষু দিদি,

আমি খুবই মজা পেয়েছি। আপনি তো দিদি, প্রতিবার টেলিভিশনের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পুরস্কার দেন। আমি ভাবছি এবার আপনার নামে একটা মনোনয়ন জমা দেব। তার পরে অনেকেই কেন সকলেই সমর্থন করবে। আর একালের সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার আপনার জন্য নিশ্চিত। কেন বলছি? ওই যে সেদিন আপনি টিভিতে লাইভ মিটিং করলেন। মিটিং মানে মানুষকে আপনি কতটা সৎ তা বোঝানোর জন্য ঝাড়া এক ঘণ্টা একাই বলে গেলেন। জানেন দিদি, সেসব শুনে যাঁরা হাততালি দিচ্ছিল তাঁরা আপনার সততা দেখে নয়, অভিনয় কৌশলের জন্য করতালি বাজিয়েছেন।

মনে করিয়ে দিই। দিনটা ছিল ২৪ জুন। দিল্লিতে প্রথম লোকসভার অধিবেশন। তার থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে আপনি সব পুরসভার কর্তা ও বিধায়কদের ডেকে নবান্নে 'লাইভ' বৈঠক করেন। সরি, আপনার দলের পুরকর্তা বিধায়কদের ডেকেছিলেন শুধু। এই ধরনের নীতি নির্ধারক বৈঠক সাধারণত রুদ্ধদ্বার হয়। কিন্তু তাতে তো হাততালি পাওয়া যায় না। আপনি গোটা রাজ্যকে দেখার সুযোগ করে দিয়ে বৈঠক করলেন। কারণ, আপনার হাততালি চাই, সততার সার্টিফিকেট চাই। কেন এটা করলেন আমি বুঝেছি। আপনিও জানেন। তবে সেটা বলার আগে সে দিনের একটু ধারাবিবরণী দিয়ে নিই।

রাস্তায় জমা জল থেকে নোংরা পরিষ্কারে অবহেলা, গাজোয়ারি করে সরকারি জমি দখল থেকে পথবাতি দেখভালের অবহেলা— পুরসভা ও পঞ্চায়েতের নাগরিক পরিষেবা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন আপনি। আপনার ভর্ৎসনা থেকে রেহাই পেলেন না কেউই। এমনকী, কয়েক জনের নাম করে কাজের সমালোচনা করেছেন। কলকাতা, হাওড়ার রাস্তার অবস্থা দেখে প্রশ্ন করেন, 'এবার কি আমাকে রাস্তা ঝাঁট দিতে বেরোতে হবে? শুধু উপর দেখলে হবে? নীচে দেখতে হবে না? রাস্তা দেখে না, আলো দেখে না! শুধু ট্যাক্স বাড়ানো আর লোক বসাচ্ছে! এছাড়া প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না! একটুও না থেমে আপনি বলে যান, 'কোথাও জবরদখল হলে কেন পদক্ষেপ হচ্ছে না?' স্পষ্টই বলে দেন, টাকার বিনিময়ে জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কেউ কেউ অনৈতিক ও অবৈধ ভাবে জমি 'ভরানোর' কাজ করছেন। আপনি বলেন, 'অনেকে আছেন এর মধ্যে। নাম বলে কাউকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না। তবে একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে। খালি জায়গা দেখলেই তাঁরা লোক বসাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের আইডেন্টিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এসবে রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।'

এরপরে নাম নিতে শুরু করে দেন আপনি। সত্যিই দারুণ সংলাপে ভরা চিত্রনাট্য! হাওড়ার নাগরিক পরিষেবা নিয়ে বলেন, 'জঞ্জাল পরিষ্কার হয় না। যিনি দায়িত্বে আছেন তাঁকে বলছি... অমৃতা রায় বর্মণ, এসডিও।' আবার জমি বেদখল নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, 'কেউ টাকা খেয়ে এ সব করছেন। নিশ্চয়ই দিয়ে-টিয়ে খাচ্ছেন। আই অ্যাম সরি। কিন্তু এসব বলতে হচ্ছে। একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে, বলতেই হচ্ছে।' আপনার কথায়, 'কোথাও আলো জ্বলছে তো জ্বলছেই। এ সবের টাকা দেবে রাজ্য সরকার! কোথাও কল থেকে জল পড়ছে তো পড়ছেই।' হাওড়া পুরসভার প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী সব দায়িত্ব নিজের কাছে রেখেছেন। কারও সঙ্গে আলোচনা করছেন না।'

এর পরের সংলাপে আপনি জনগণের মুখের কথা বলে মন্তব্য করেন, 'দেখেন না, লজ্জাও লাগে না? জনগণ পরিষেবা না পেলে পুরসভা-পঞ্চায়েত রেখে লাভ কী? কোথাও ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে নিয়ে বিক্রিও করে দেন অনেকে। তার জন্য কেন একটা সিস্টেম তৈরি হচ্ছে না? কেন জল অপচয় হচ্ছে? 'অটোমেটেড' কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না?' এর পরে আবার হাততালি পাওয়ার মতো সংলাপ। 'লোভ বেড়ে যাচ্ছে। লোভটাকে কমাতে হবে। সরকারি জমি দখল করে একটার পর একটা বড়ো বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। রাজ্য সরকার নতুন রাস্তা তৈরি করেছে। তার রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। কেন এ সব হবে? দেখার দায়িত্ব কেবল আমার?'

সত্যিই তো আপনার দেখার কথা নাকি! এত সব মন্ত্রী সান্ত্রী কী করতে রয়েছে? আপনি আগে কিছুই জানতেন না বুঝিয়ে বলেন, 'হাতিবাগানে কখনও তাকিয়ে দেখিয়েছেন? কী অবস্থা ওখানে। গড়িয়াহাটে হকার বসিয়েছেন। সেদিন ওয়েবেলের সামনের (বিধাননগর) রাস্তা দিয়ে আসছিলাম। দেখলাম একের পর এক দোকান বসিয়ে দিয়েছে। দেখতে ভালো লাগছে?' মন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্দেশে বলেন, 'রাজারহাটে সুজিত লোক বসাচ্ছে কম্পিটিশন করে।' আবার পুলিশকে ভর্ৎসনা করে আপনি পুলিশমন্ত্রী বলেন, 'সবাই চোখে ঠুলি পরে আছে! কারও চোখে কিচ্ছু পড়ছে না। অবৈধ ভাবে তলার পর তলা উঠছে। দু'-এক জনকে অ্যারেস্ট তো করুন! বেআইনি যদি হয়, 'স্টার্ট ফ্রম মাই হাউস।' কেন বাইরের লোক বসবেন এখানে? একটা করে ত্রিপল লাগাচ্ছে, একজন করে বসে পড়ছে।' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করেন, 'হোয়াই? হোয়াই? হোয়াই?'

এখন আমার প্রশ্ন, 'হোয়াই'? কেন আপনি এমন খুল্লামখুল্লা নিজের প্রিয় ভাইদের সমালোচনা করলেন? সবই আগে থেকে জানতেন। তবে এখন কেন করলেন? কারণ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় লোকসভা ভোটে বেড়েছে বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের হার। ২০২১ সালে ছিল ৩৭.৯৭ শতাংশ। এবার সেটা বেড়ে ৩৮.৭৩ শতাংশ হয়েছে। জয় ছিল ৭৭ আসনে। এবার ৯০ আসনে এগিয়ে। শহরাঞ্চলে ভোট আরও কমেছে। তাই আপনার টনক নড়েছে। সব দোষ অন্যের, আপনি ধোয়া তুলসীপাতা বোঝাতেই তো এই বৈঠক ও বক্তৃতা। আপনার অভিনয়ের জয় হোক!

□

অতিথি কলম

উপমন্যু হাজারিকা

অসম জুড়ে দীর্ঘায়িত হচ্ছে ইসলামি ছায়া

ভারতের ৫২৫টি জনজাতি সমাজের মধ্যে ২৪৭টি জনজাতির অবস্থান হলো উত্তর-পূর্ব ভারতে। দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় সাড়ে চার-পাঁচ কোটি লোকের বাস উত্তর-পূর্বে। জনসংখ্যার নিরিখে অসমের কিছু ছোটো ছোটো জনজাতি সম্প্রদায়, যেমন— তাই ফাকে বা তাই খামিয়াম হলো বৌদ্ধ মতাবলম্বী সম্প্রদায় যাদের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। এর মধ্যে অধিকাংশ সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যেই যাবতীয় ব্যবসায়িক লেন-দেন করে থাকে। এভাবেই এইসব অঞ্চলে এককালে বিস্তৃত হয়েছিল হিন্দুধর্ম। কিন্তু বিগত ১০০ বছরে, বিশেষত স্বাধীনতার পরে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়ের মতো রাজ্যগুলিতে খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমানে এই অঞ্চলগুলিতে খ্রিস্টানরা হয়ে উঠেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

যদিও উত্তর-পূর্ব ভারতে ডেমোগ্রাফি বা জনবিন্যাসের সব চেয়ে বড়ো পরিবর্তনের কারণ হলো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ। স্বাধীনতার আগে থেকেই অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোক ঢুকিয়ে উত্তর-পূর্বের জনবিন্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্রিটিশরা তাদের প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার পর উৎসাহ ও মদত দেওয়া চলতে থাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পায় বহু গুণ। অনুপ্রবেশের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে অসমে। উত্তর-পূর্বের অন্য রাজ্যগুলি তপশিলি উপজাতি বহুল হওয়ার কারণে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জমি, প্রাকৃতিক ও আর্থিক সম্পদ, চাকরিতে বা কর্মক্ষেত্রে স্থানীয় জনজাতিদের অধিকার স্বীকৃত ও সুরক্ষিত। বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা অর্থহীন ও ভূমিহীন। ভারতের যে কোনো অঞ্চলে ঢুকে জায়গা-জমি দখল করার প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা যায়। উত্তর-পূর্ব ভারতে তাদের আগমনের এটি একটি প্রধান কারণ। অসম বাদ দিয়ে উত্তর-পূর্বের অন্য রাজ্যগুলিতে প্রচলিত আইন অনুযায়ী স্থানীয়রা ছাড়া সেই রাজ্যের জমি-জায়গা কেউ কিনতে বা দখল নিতে পারবে না। কিন্তু উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসমে সেই রকম আইন বলবৎ না থাকার দরুন মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা এই দেশে ঘাঁটি গাড়ার উদ্দেশ্যে বিকল্প পথ হিসেবে অসমকেই বেছে নিয়েছে। এই রাজ্যে বসতি স্থাপনের পাশাপাশি সবরকম সরকারি সহায়তা, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারা বিপুল সুযোগসুবিধা পায়।

এইভাবে এই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা অসমের জনবিন্যাসের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ১১৪৪, যেখানে ২০১১ সালের ভারতীয় জনগণনা অনুযায়ী অসমে জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৮২। ১৯০১ সালে অসমের একটিও জেলা মুসলমান বহুল ছিল না। ১৯৫১ পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও কোনো জেলা মুসলমান বহুল ছিল না। কিন্তু ২০০১ থেকে ২০১১- এই ১০ বছরে অসমের জনবিন্যাসে এলো প্রবল পরিবর্তন। যার প্রভাবে এই রাজ্যের ৯টির মধ্যে ৬টি জেলা হয়ে উঠলো মুসলমান সংখ্যাবহুল। ১৯৭১-এর পর জনবিন্যাসের এই ব্যাপক পরিবর্তনের শুরু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য 'ভিত্তিবর্ষ' হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে এই ১৯৭১ সাল। ১৯৭১ সালে অসমে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৭২.৫ শতাংশ যা ২০০১ ও ২০১১ সালে যথাক্রমে কমে দাঁড়ায় ৬৪.৯ ও ৬১.৪৬ শতাংশে। এই পরিসংখ্যানের বিপ্রতীপে ১৯৭১ সালে অসমে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল--- ২৪.৬ শতাংশ, ২০০১ সালে যা বেড়ে হলো ৩০.৯ শতাংশ। ২০১১ সালে মুসলমানদের সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪.২ শতাংশে। অর্থাৎ, ২০০১-২০১১--- এই ১০ বছরে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার— ৪০ শতাংশ। যদিও জনবিন্যাসের পরিবর্তন সম্পর্কিত এই সমস্যার প্রকৃত চিত্র আরও ব্যাপক ও বৃহত্তর।

উত্তর-পূর্ব তথা অসমে অনুপ্রবেশের বিষয়ে তিনটি সরকারি তথ্যসূত্র রয়েছে। ১৯৯২ সালে অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সইকিয়া ৩২ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী অসমে রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। ২০০৪ সালে সংসদে ইউপিএ সরকার অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা ৫০ লক্ষ বলে জানায়। ২০১৬ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা হলো ৮০ লক্ষ। এইসব সরকারি রেকর্ড ছাড়াও অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত তিনটি বেসরকারি মত রয়েছে। সেই মতানুযায়ী, ২০৪০ থেকে ২০৫১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলমান সংখ্যাধিক্য রাজ্যে পরিণত হতে চলেছে অসম। ২০২১ সালের জনগণনার তথ্য এখনও পর্যন্ত না থাকায় বাস্তব পরিস্থিতি থেকে অনুমান যে অসমে মুসলমান জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই ৩৮-৪০ শতাংশে পৌঁছেছে। অনুপ্রবেশের ঘটনাকে বিগত ও হালফিলের প্রতিটি সরকার ও রাজনৈতিক দল উত্তর-পূর্বের স্থানীয় ও মূল অধিবাসীদের পরিচয় ও জাতিসত্তার ওপর ঘনিয়ে ওঠা বিপদ ও আঘাত বলে মানলেও এই বেআইনি অনুপ্রবেশ রোধে তারা নামমাত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার পরিণাম হলো শূন্য।

বেড়েই চলেছে অনুপ্রবেশ : গত ২০ বছর ধরে একটি মুসলমান জনসংখ্যা বহুল রাজ্য হিসেবে অসমের আত্মপ্রকাশের কারণগুলি জন্ম হার এবং মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি কেন্দ্রিক। মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই উচ্চ হারের বিষয়টির মধ্যে কিন্তু অনুপ্রবেশ অন্তর্ভুক্ত নয়। অসমের ভূমিপুত্র স্থানীয় অধিবাসীদের অস্তিত্ব ও পরিচিতি রক্ষার জন্য যদি কিছুই না করা হয়, তবে তারা অচিরেই সংখ্যালঘুর তকমা পাবে। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে, এই দেশ থেকে তাদের তাড়াতে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের রক্ষার জন্য ১৯৭০-এর দশক থেকে অসমজুড়ে গড়ে ওঠে প্রবল গণ আন্দোলন। যার পরিণামস্বরূপ ১৯৮৫ সালে হয় অসম চুক্তি এবং ২০১৬ সালে অসমে শুরু হয় এনআরসি-র কাজ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দ্বারা গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অসমের জায়গা-জমির ওপর ১৯৫১ সালের রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব রেজিস্টারে নাম নথিভুক্ত থাকা লোকজনের অধিকারের বিষয়টিতে সিলমোহর পড়ে। 'অসম অ্যাকর্ড' বা অসম চুক্তির অন্তর্গত ৬ নং ধারা বা পরিচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত

হয় এই কমিটি। কেন্দ্রীয় সরকার, অসম সরকার এবং অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সংগঠনের মধ্যে হওয়া ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরিণামস্বরূপ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে অসমে আসা সব বাংলাদেশিকে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। ভারতীয় সংবিধানের ৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্য দেশ থেকে আগত নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ভিত্তিবর্ষ হলো— ১৯৪৮। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাই তারিখের আগে যারা ভারতে প্রবেশ করেছেন তারা ভারতীয় নাগরিক। এই কারণে অসম চুক্তিতে অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সাল-তারিখ ছিল ভারতের অন্য রাজ্যগুলির থেকে ভিন্ন। সংবিধান নির্ধারিত ১৯৪৮-এর পরেও ২৩ বছর ধরে অসম চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া অনুপ্রবেশকারীদের ভার বহন করে চলে এই রাজ্য। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অসমে আন্দোলনে শামিল হওয়া জনতাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে ১৯৭১ সালের পর অসমে বেআইনিভাবে প্রবেশ করা সব বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পরিচিতি নির্ধারণ করে তাদের বিষয়ে তৈরি করা হবে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতিই সার, কোনো কিছুই করা হলো না। এমনকী অনুপ্রবেশ রোধে নেওয়া হলো না কোনো পদক্ষেপ। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালে অসমে ছিল ৮০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, অসমের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩.৩ কোটি। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা অসমের মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ। অনুপ্রবেশের ইস্যু তুলে ধরে রাজনীতির মঞ্চে উত্তরণ ঘটলো অনেক নেতার। নিজেদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে এই ইস্যুটিকে হাতিয়ার করে তারা রাজনীতি করলেন এবং প্রয়োজন ফুরোলে ইস্যুটিকে ত্যাগ করলেন কারণ অনুপ্রবেশ ঠেকানোর পরিবর্তে ভোট ব্যাংকের ব্যাপারে তারা আসলে আগ্রহী ছিলেন।

এনআরসি বা ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্স হলো ভারতীয় নাগরিকদের তথ্য সংবলিত ও নাগরিকদের জন্য তৈরি একটি রেজিস্টার, ১৯৫১ সালে যা সব অসম-নিবাসীদের জন্য বলবৎ করা হয়। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক এই রেজিস্টার আপডেট করার কাজ শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে থেকে অসমে বসবাসরতদের বা সেই বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষদের পরিচয় নির্ধারণ ছিল এই কাজের উদ্দেশ্য। ১৯৫১ সালে যারা নাগরিক ছিলেন বা সেই সময় অসমে নিজেদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিতির তথ্যপ্রমাণ সংবলিত নথিপত্র দাখিলে যারা সক্ষম— তাদের নাম ও তথ্য আপডেটেড এনআরসিতে নথিভুক্তি ছিল এই কাজের মুখ্য বিষয়। এই ক্ষেত্রে অসমের বাসিন্দারা ছিলেন দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীভুক্ত হলেন তারা— ১৯৫১ সালের নাগরিক রেজিস্টারে যাদের নাম নথিভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন তাদের উত্তরসূরি এবং সেই সন্তানসন্ততির পরবর্তী প্রজন্ম। সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিমে কোর্টের নজরদারিতেই চলছিল এনআরসি আপডেশনের এই কাজ। কিন্তু আদালতের পর্যবেক্ষণে এই কাজ চললেও এনআরসিতে তথ্য নথিভুক্তিকরণের এই কাজে বড়ো ধরনের গোলমাল ঘটে। বিশেষত অসমের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে প্রচুর বিদেশি অনুপ্রবেশকারী এনআরসিতে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে ফেলে।

অসমে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মামলা শোনার ও তাদের বিচারের জন্য নির্ধারিত আদালতগুলি যাদেরকে 'বিদেশি' বলে ঘোষণা করেছিল, সেই অনুপ্রবেশকারীরা প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে নানাভাবে প্রভাবিত করে এনআরসিতে তাদের নাম নথিভুক্ত করে। ধুবড়ি জেলায় আদালত ঘোষিত ২৬ হাজার বিদেশির মধ্যে সকলের নাম এনআরসির অন্তর্ভুক্ত হয়। এমনও মামলা রয়েছে যেখানে একজনকে বিদেশি বলে ঘোষণা করা হয়, সরকারি হেফাজতে থাকাকালীন তার মামলা ছিল সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন। তার নাম পর্যন্ত এনআরসিতে নথিবদ্ধ হয়।

এনআরসির প্রক্রিয়া চলাকালীন সেখানে গরমিল ঘটানোর লক্ষ্যে এই অনুপ্রবেশকারীরা অত্যন্ত সংগঠিতভাবে সবরকম প্রয়াস চালায় যাতে এনআরসির তালিকায় তাদের নাম উঠে যায়। এনআরসি প্রক্রিয়া চলাকালীন জমা হওয়া তথ্যপ্রমাণ, দলিল-দস্তাবেজের সত্যতা নিরূপণে প্রতিটি আবেদনকারীর ঘরে অনুসন্ধান বা নিরীক্ষণ দলের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে এই অনুসন্ধান টিমগুলি প্রতিটি ঘরে গিয়ে জমা পড়া নথিপত্রের সত্যতা যাচাই করেনি। প্রতিটি বাড়িতে সরেজমিনে যাওয়ার পরিবর্তে এই দলগুলি দায়সারাভাবে আবেদনকারীর দু'জন প্রতিবেশীর সাক্ষ্য বা বয়ান রেকর্ড করে। তাদের সেই বয়ান বা বিবৃতি অনুযায়ী আবেদনকারী হলো নাগরিক। আবার সেই একই কায়দায় ওই আবেদনকারীও প্রমাণ করতো যে তার প্রতিবেশী হলো ভারতীয় নাগরিক। এনআরসিতে নথিবদ্ধ অধিকাংশ তথ্যই ডিজিটালাইজড্ হওয়ার কারণে অনলাইনে সহজলভ্য। তাই এই তথ্যাবলীর ভিত্তিতে গোটা এনআরসির প্রক্রিয়াটিকে পুনরায় যাচাই করা খুব একটা দুরূহ কাজ নয়।

বাংলাদেশের দুর্বল অর্থনীতি, বাংলাদেশে জামি-জমা, কাজ ও অন্যান্য সম্পদের অভাব হলো অসমে ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশের মূল কারণ। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সেই রাজ্যের সব জমি ও সম্পদের ওপর বনবাসীদের অধিকার সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হওয়ার দরুন সেই রাজ্যগুলিতে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু অসমে নকল পরিচয়পত্র তৈরি করে নাগরিকত্ব সমেত জমি-জায়গা, সম্পদ ও সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য অবৈধ অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গিয়েছে এই রাজ্য। উত্তর-পূর্বের অন্য রাজ্যগুলির মতো আইনের অনুপস্থিতি অসমে অনুপ্রবেশকে ত্বরান্বিত করছে। ১৯৫১ সালের এনআরসির তথ্যের ওপর জোর দেওয়া এবং উত্তর-পূর্বের অন্য রাজ্যগুলির মতো আইন প্রণয়নও বলবৎ করার মধ্যে দিয়েই অনুপ্রবেশে লাগাম দেওয়া সম্ভব।

সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা এই প্রতিবেদকের নেতৃত্বে নিযুক্ত একটি কমিশন (উপমন্যু হাজারিকা কমিশন) ২০১৫ সালে এই বিষয়ে কিছু সুপারিশ করে। সীমান্তে ফাঁকফোকর বন্ধ করে অনুপ্রবেশ রোধের প্রস্তাব দিয়ে আদালতে এই কমিশন চারটি রিপোর্ট জমা করে। সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতির বিবরণ ছাড়াও, পুরোপুরি অনুপ্রবেশ রোধে এই রাজ্যের জমি, চাকরি-ব্যবসা সব কিছুতে ১৯৫১ সালের এনআরসিতে যে অসমবাসীদের বা তাদের পূর্বপুরুষদের নাম নথিভুক্ত রয়েছে, সেই স্থানীয় বা অসমের ভূমিপুত্রদের অধিকারের স্বীকৃতিদানের সুপারিশ সেই রিপোর্টগুলিতে করা হয়েছে। অসমে এনআরসির তথ্য সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়নি। অসম চুক্তির ৬ নং ধারা অনুযায়ী গঠিত কমিটির রিপোর্ট কেন্দ্র ও অসম রাজ্য সরকারের কাছে রয়েছে। এর মধ্যে উপমন্যু হাজারিকা কমিশনের রিপোর্টও জমা রয়েছে। সেই রিপোর্টগুলির ভিত্তিতে শক্ত ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে ২০৪০ সালের মধ্যে অসমের স্থানীয় জনতা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। এনআরসির প্রক্রিয়া চলাকালীন জমা পড়া তথ্যাবলী কঠোর ভাবে যাচাই এবং ভূমিপুত্রদের আইনি রক্ষাকবচ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে এখনও এই বিপন্মুক্তি সম্ভব।

(লেখক সুপ্রিম কোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী)

ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে মিছিল ও সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্য জুড়ে বিরোধী দলের কর্মী, সমর্থকদের ওপর ব্যাপক ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস অব্যাহত। পশ্চিমবঙ্গে এই নির্বাচন পরবর্তী হিংসা এবং হিন্দুদের উপর চলতে থাকা বর্বরোচিত ও নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে 'বঙ্গ বিবেক' -এর পরিচালনায় গত ২৪ জুন কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত আয়োজিত হয় একটি প্রতিবাদ মিছিল ও সভা। রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা যখন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে তখন এই পরিস্থিতিতে পুলিশের কাছে প্রতিবাদ মিছিল ও সভার অনুমতি চেয়েও পাওয়া যায়নি। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বঙ্গ বিবেক। আদালত অনুমতি দেওয়ার পরেই এই দিন কলকাতায় সংঘটিত হলো বঙ্গ বিবেকের মিছিল ও প্রতিবাদ সভা।

প্রসঙ্গত, আদালতের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যা বেঁধে দিয়ে বঙ্গ বিবেক সংস্থাকে ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হয়। আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে কলকাতায় আয়োজিত হয় এই পদযাত্রা। রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলছেন যে পুলিশ যখন সরকারের দলদাসে পরিণত হয়, যখন আইনের শাসন রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় রাজ্য, তখন প্রতিবাদীদের এভাবেই এগিয়ে আসতে হয়। রাজ্যজুড়ে হিন্দুদের ওপর সংঘটিত অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যবাসীর সংগঠিত প্রতিবাদ একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। এই রাজ্যের হিন্দুসমাজ আজ অস্তিত্ব সংকটের মুখে। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ মুখর হওয়া ছাড়া হিন্দুদের সামনে বিকল্প পথ নেই।

দুপুর দুটোয় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় রানি রাসমণি রোডে। মিছিল শেষের পর রানি রাসমণি রোডে প্রতিবাদী জনতার জমায়েতের পর শুরু হয় সভা। শাসক দলের সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ দেওয়া মানুষদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সভার শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন মানিক চন্দ্র পাল, ড. জিষ্ণু বসু, কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য, দেবাঞ্জন পাল ও দেবাশিস চক্রবর্তী। বক্তাদের সকলেই রাজ্য সরকার ও এই রাজ্যের শাসক দলের দ্বারা হিন্দুদের ওপর নামিয়ে আনা চরম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে সোচ্চার হন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গে রামনবমীর শোভাযাত্রায় জেহাদিদের আক্রমণ থেকে সন্দেশখালিতে মা-বোনেদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতনের প্রসঙ্গ। বক্তারা বলেন যে ২০২১-এর বিধানসভা ও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী এই ব্যাপক সন্ত্রাস প্রকৃতপক্ষে ভোট পরবর্তী হিংসার আড়ালে হিন্দু নিপীড়ন। শাসক দল ও জেহাদিদের সন্ত্রাসে বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার লোক ঘরছাড়া, অসংখ্য মহিলা সম্ভ্রমহানির শিকার। ব্যাপক ভাবে চলছে দোকান লুঠ, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, জরিমানা আদায়। বহু মানুষ ইতিমধ্যেই সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন। অনেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করে সভার বক্তারা প্রত্যেকেই এই কঠিন পরিস্থিতিতে আপামর হিন্দুসমাজকে সংগঠিত ও একজোট হওয়ার আহ্বান জানান। প্রতিবাদ সভাটি সঞ্চালনা করেন নন্দিনী রায়। বঙ্গ বিবেক সংগঠনের তরফে প্রতিনিধিরা রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। বাস্তবিক অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুসমাজের ঐক্যবদ্ধ ও প্রতিবাদী সত্তার পরিচয় দিল বঙ্গ বিবেক পরিচালিত এই পদযাত্রা ও প্রতিবাদ সভা।

বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হতে চলেছে : এ দায় কে নেবে?

সরকার চুপ থাকার কারণেই কুচক্রীমহল হিন্দুদের টার্গেট করে তাঁদের দেশ ত্যাগ করাতে সাহস পাচ্ছে। দেখা গেছে কোনো সরকারই হিন্দু স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়নি, এমনকী দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করে না।

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

মাতৃভূমি ত্যাগ করা কঠিন ও কঠোরতম কাজের মধ্যে একটি। মানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম। কোনো পশু, প্রাণী, এমনকী পাখিও তার বাসা ছেড়ে যেতে চায় না। ঝড়ের কারণে যদি কোনো পাখির বাসা ভেঙে মাটিতে পড়ে যায় পাখি কিন্তু তাতে বসেই আগামী সময়ের কথা ভাবতে থাকে। নিজের জন্মভূমির প্রতি এ টান প্রাকৃতিক। কিন্তু মানুষের বেলাও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। অনেক সমস্যা মোকাবিলা করার পরেও মরণকামড় দিয়ে মাতৃভূমিকে বুকে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু বাস্তবে অসহ্য যন্ত্রণার সামনাসামনি হয়ে আর যখন পারে না তখন হয়তো প্রাণ দেয়, নয়তো চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য হয়। কী পরিমাণ নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে চলেছে বাংলাদেশ আজ তার ছবি স্পষ্ট। ওই ভূখণ্ডে যখন কোনো এক শ্রেণীর মানুষের বেলা এই ঘটনা ঘটে তখন আমাদের তা ভাবিয়ে তোলে। আমরা ভাবতে বাধ্য হই এবং কারণ খুঁজতে থাকি।

বাংলাদেশে এই ঘটনার পেছনে কী কাজ করে যাচ্ছে সে বিষয়ে সামান্য ধারণা দিতে গিয়েই কিছু তথ্য তুলে ধরতে চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৯০১ সালে দেশটিতে প্রথম জনগণনা করা হয়। সে গণনায় হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৩৩ শতাংশ। এরপর প্রতি ১০ বছর অন্তর পরিচালিত জনগণনাতে এই হার কমতে দেখা যায়। অর্থাৎ হিন্দু কমে যাওয়ার এ প্রবণতা ১০০ বছরের বেশি পুরোনো। দেশটি পাকিস্তান- কালীন সময়ের পর এবং স্বাধীনতা লাভের কিছুটা পরে জনগণনায় যে তথ্য উঠে আসে তা দেখে কোনোক্রমেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জনগণনা হয় ১৯৭৪ সালে। তখন হিন্দু জনসংখ্যা ৩৩ শতাংশ থেকে নেমে ১৩.৫ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। এই পরিসংখ্যান আমাদের কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল। এরপর আরও চারটি আদমশুমারি হয়েছে। সর্বশেষ ২০১১ সালের জনগণনাতে দেখা গেছে, দেশের মোট জনসংখ্যার ৮.৫ শতাংশ হিন্দু (যা আসলে ৩ শতাংশ)। দেশে হিন্দু জনসংখ্যার হার ক্রমাগত কমছে। গত ৫০ বছরে মোট জনসংখা বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এই সময়ে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যার হার মোটামুটি কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা-ই ছিল।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত (বিবিএস) ওই জনগণনা ও গৃহগণনা প্রতিবেদন দেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করেছে। প্রথমত, হিন্দুদের আউট মাইগ্রেশন হচ্ছে, অর্থাৎ হিন্দুরা দেশ ছাড়ছে। দ্বিতীয়ত, হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট প্রজনন হার বা টোটাল ফার্টিলিটি রেট তুলনামূলক কম। অর্থাৎ হিন্দু দম্পতিরা তুলনামূলকভাবে কম সন্তানের জন্ম দেন। সরকারিভাবে এই যুক্তি দাঁড় করিয়েছে ঠিকই। কিন্তু এর পেছনে কারণ প্রথমটাই যদি আমরা ধরে নিই তা হলে হিন্দুদের দেশ ত্যাগের কারণ কী? একটা দেশ হতে নির্দিষ্ট এক ধর্ম বিশ্বাসী লোকেরা দেশ ত্যাগ করে যাচ্ছে সেটা খতিয়ে দেখার দায় দায়িত্ব সরকারেরই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই যে, এই ইস্যুটি দেখা কারও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। এ উন্নাসিকতা ও উদাসীনতা একটি দেশের পক্ষে সুখকর নয়।

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার হার ক্রমাগত কমছে। গত ৫০ বছরে দেশে মোট জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বরং হিন্দুদের সংখ্যা কমেছে দ্রুত হারে। এই সময়ে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যার হার কমেনি। তাহলে সেখানে কি ভৌতিক কিছু ঘটে চলেছে? আসলে ভৌতিক কিছু নয়। সবটুকুই সরকারি কৌশলী সন্ত্রাস।

বিবিএস বা সরকারের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রজনন হারের কোনো তথ্য বা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ-সহ (আইসিডিডিআরবি) তিনটি প্রতিষ্ঠানের একদল গবেষক দেশের একটি ছোটো এলাকার জনমত বিশ্লেষণ করে বলছেন, দেশত্যাগ ও প্রজনন হার কম হওয়া ছাড়াও হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে নবজাতকের মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে সামান্য বেশি। এই পরিসংখ্যান সর্বৈব বানোয়াট ও অগ্রহণযোগ্য। অনেকটাই সত্যকে পাথর চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। রাজনৈতিক নেতা, সমাজবিজ্ঞানী, হিন্দু সমাজের নেতা

ও গবেষকেরা একমত যে দেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার প্রধান কারণ সীমাহীন নিষ্ঠুরতার ফলে হিন্দুদের দেশত্যাগ। তবে তারাও এর কারণ ও প্রতিকার নিয়ে কিছু বলেননি। রোগ নির্ণয় করে তার প্রতিকারের কোনো দিশা তাঁদের চিন্তার বাইরে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের বিষয় নিয়ে তিন দশকের বেশি সময় ধরে গবেষণা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারাকাত। তিনি বছরখানেক আগে প্রথম সারির একটি দৈনিক 'প্রথম আলো'কে বলেন, 'কোনো মানুষ নিজের মাতৃভূমি, নিজের বাড়িঘর, ভিটামাটি ছেড়ে অন্য দেশে যেতে চান না। অত্যাচারের কারণে বাংলাদেশের হিন্দুরা দেশ ছাড়ছেন, তাঁদের সংখ্যা দ্রুত কমছে। শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনের কারণে অনেকে নিঃস্ব হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এটা বেশি ঘটেছে গ্রামের দুর্বল হিন্দুদের ক্ষেত্রে। কারণ আরও আছে।' হিন্দুদের দুর্গাপূজার সময় কোরান অবমাননার ঘটনার জের ধরে দেশের অনেক জায়গায় পূজামণ্ডপ ও মন্দির ভাঙচুর এবং হিন্দুদের বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়ার পাশাপাশি লুটপাট হয়েছে, মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। নাসির নগরে হিন্দু প্রধান এলাকায় মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে শতশত বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে আসলে ওখানে হচ্ছেটা কী?

হিন্দুদের জনসংখ্যার হার যদি ৫০ বছর আগের মতো থাকত, তাহলে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুর সংখ্যা কত হতো, তা একটি প্রশ্ন। ২০১১ সালে সর্বশেষ জনগণায় জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার। ৫০ বছর আগের হার (১৩.৫ শতাংশ) ঠিক থাকলে হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটি ২ লক্ষ ১৯ হাজার হওয়ার কথা। কিন্তু সর্বশেষ জনগণনায় অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার সাড়ে ৮ শতাংশ ছিল হিন্দু। এ হিসেবে সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি ২৭ লক্ষের কিছু বেশি। অর্থাৎ ৫০ বছরে হিন্দুদের যে সংখ্যা হতে পারত, তার চেয়ে প্রায় ৭৫ লক্ষ কম।

জনসংখ্যাবিদেরা একে বলেছেন 'মিসিং হিন্দু পপুলেশন' বা 'হারিয়ে যাওয়া হিন্দু জনগোষ্ঠী'। প্রতি দশকে ১৫ লক্ষের বেশি হিন্দু কমে যাচ্ছে। এর পেছনে দেশান্তর হওয়ার পাশাপাশি প্রজনন হার কম হওয়া এবং মৃত্যুহার বেশি হওয়ার বিষয়টি যুক্ত করার যৌক্তিকতা আমাদের বোধগম্য নয়।

অসাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে জন্ম নেওয়া স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ক্রিস্টান-সহ সব ধর্মাবলম্বীর অধিকার সমান বলে স্বীকৃতি পায়। দেশ পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে পাকিস্তান আমলের অর্পিত সম্পত্তি আইন বহাল থাকে, যা খুবই বৈষম্যমূলক।

সরকারি ভাবে প্রথম আঘাতটি আসে ১৯৭৭ সালে, যখন পঞ্চম সংশোধনী অনুমোদনের মাধ্যমে সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। এর ১১ বছর পর ১৯৮৮ সালের জুনে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সংগঠন এই ঘোষণার বিরোধিতা করেছিল। দুটি ঘটনা সামরিক সরকারের আমলে হলেও পরবর্তীকালে কোনো গণতান্ত্রিক সরকার সরকারি আদর্শকে অসাম্প্রদায়িক অবস্থানে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি।

সাধারণ হিন্দুদের অনেকে মনে করেন, দেশত্যাগের অন্যতম কারণ অর্পিত সম্পত্তি আইন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এই আইন (শত্রু সম্পত্তি) করেছিল পাকিস্তান সরকার। যুদ্ধ শেষ হলেও আইনটি এখনও বলবৎ আছে। এই আইনের অজুহাতে সারা দেশে হাজার হাজার হিন্দু পরিবার জমি হারিয়েছে, হয়েছে বাস্তুচ্যুত এবং অসহায়, নিরুপায়।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেছিলেন হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের পর সাংবিধানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালি জাতিকে ধর্মের নামে বিভক্ত করা হয়েছে। হিন্দুদের সরকারি সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছে। হিন্দুরা পাকিস্তান আমলে সমনাগরিকত্ব পাননি, স্বাধীন বাংলাদেশেও তাঁরা একই পরিস্থিতির শিকার। ইসলামিক স্টেটের জন্য হিন্দু-মুসলমান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেননি। আজকের এই সমস্যা জাতীয় সমস্যা, রাজনৈতিক কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধেও হিন্দুদের টার্গেট করেই লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যার সংখ্যা ছিল সবচাইতে বেশি।

অন্যদিকে হিন্দু জনসংখ্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন বাংলাদেশের আরও তিনজন গবেষক। প্রধান গবেষক মো. মঈনুদ্দীন হায়দার আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশে (আইসিডিডিআরবি) কর্মরত। মিজানুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারোলিনা পপুলেশন সেন্টারের গবেষক। নাহিদ কামাল পপডেভ কনসালট্যান্সি লিমিটেড নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষক। তাঁদের লেখা 'হিন্দু পপুলেশন গ্রোথ ইন বাংলাদেশ : আ ডেমোগ্রাফিক পাজেল' নামের গবেষণা প্রবন্ধ ২০১৯ সালে নেদারল্যান্ডস থেকে প্রকাশিত জার্নাল অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড ডেমোগ্রাফিতে ছাপা হয়। তাতে গবেষকেরা চাঁদপুর জেলার মতলব এলাকায় ১৯৮৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মুসলমান ও হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রজনন হার, মৃত্যুহার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন।

গবেষকেরা দেখিয়েছেন, ১৯৮৯ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে মতলবের ৫ হাজার হিন্দু দেশত্যাগ করেছেন; তাঁদের ৮৯ শতাংশ গেছেন ভারতে। অন্যদিকে ২০০৫ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ১ হাজার ৯৩৭ জন দেশত্যাগ করেছেন, তাঁদের ৩১ শতাংশ গেছেন ভারতে, ৪৫ শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যে এবং বাকি ২৪ শতাংশ গেছেন ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে।

ওই সময়কালে দেখা গেছে, প্রতি হাজার জনসংখ্যায় হিন্দু জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির হার মুসলমানের চেয়ে ২ শতাংশ কম। তিন বছরে একজন মুসলমান নারীর সন্তান জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনা যেখানে ৩৫ শতাংশ, হিন্দু নারীর মধ্যে তা ৩২ শতাংশ। যদিও গবেষণাটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। তারা আরও বলেন হিন্দুদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রী ব্যবহারের হার বেশি। তাঁদের মধ্যে গর্ভপাত ঘটানোর হারও বেশি। দুটির পর আর সন্তান নিতে না চাওয়া নারীর হার হিন্দুদের মধ্যে বেশি। মুসলমানদের মধ্যে কম বয়সে বিয়ের প্রবণতা বেশি। এ ধরনের আরও কিছু সূচক বিশ্লেষণ করে গবেষকেরা বলছেন, হিন্দুদের প্রজনন হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম। তবে হিন্দুদের মধ্যে মৃত্যুহারও সামান্য বেশি। গবেষকেরা তথ্য বিশ্লেষণ করে বলছেন, মতলবে প্রতি ১০ হাজার জনের মধ্যে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের ৪টি মৃত্যু বেশি।

উপসংহারে গবেষকেরা বলছেন, ১৯৮৯ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মুসলমানদের তুলনায় যতটুকু কম ছিল, তার ৫৪ শতাংশ আন্তর্জাতিক অভিবাসন বা দেশ ছাড়ার কারণে, ৪১ শতাংশ প্রজনন হার কম হওয়ার জন্য এবং বাকি ৫ শতাংশ মৃত্যুহার বেশি হওয়ার কারণে। তাঁরা আরও বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভিবাসনের চেয়ে প্রজননের হারই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম বলেন, তিনটি জনমিতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনসংখ্যার হার বাড়ে বা কমে। সেগুলো হচ্ছে জন্মহার, মৃত্যুহার ও স্থানান্তর। বৈশ্বিকভাবে মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মহার অধিক, এটা বাংলাদেশেও বেশি। তবে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে মৃত্যুহারে কোনো তারতম্য আছে কি না, তা নিয়ে বড়ো গবেষণা হওয়া দরকার।

১৯৬১ সালের পরিসংখ্যানে বলা হয়েছিল, তৎকালীন খুলনা জেলায় হিন্দুদের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি ছিল। খুলনা এখন তিনটি জেলায় বিভক্ত— খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা। এই জেলাগুলোতে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঋণাত্মক। অর্থাৎ জনসংখ্যা কমছে।

বরিশাল বিভাগের ছয়টি জেলাতেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনায় ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৫১ জন। ২০১১ সালের জনগণনায় সংখ্যা কমে হয়েছে ৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৭৯। একইভাবে ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও কিশোরগঞ্জে এবং রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলায় মোট হিন্দুর সংখ্যা কমেছে। একইভাবে কমেছে চাঁদপুর, বি বাড়িয়া, নোয়াখালি, নারায়ণগঞ্জ-সহ সর্বত্র।

ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বঙ্গের রাজধানী হিসেবে কলকাতার প্রতিষ্ঠা, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের মতো বড়ো বড়ো ঘটনা পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের হিন্দুদের একটি অংশকে ভারতমুখী করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেন। শরণার্থীদের বড়ো একটি অংশ ছিল হিন্দু সমাজের। মুক্তিযুদ্ধ শেষে সব শরণার্থী দেশে ফিরে আসেননি, ফিরে এলেও কেউ কেউ আবার ভারতে চলে যান।

১৯৫০ সালে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, ১৯৬৫ সালের ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধ, যুদ্ধকালে তৈরি করা অর্পিত সম্পত্তি আইন হিন্দুদের দেশত্যাগে প্রভাবিত করেছে। ১৯৯০ সালে ভারতের বাবরি ঢাঁচা অপসারণের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চরমে ওঠে। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় এবং এর পরে একই ধরনের নির্যাতনের ঘটনা ঘটে বিভিন্ন জেলায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ট্যাটাস দেওয়া নিয়ে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে ২০১২ সালে এক তরুণের দেওয়া স্ট্যাটাসের কারণে রামু, উখিয়া ও পটিয়ার বহু বৌদ্ধমন্দির পুড়িয়ে দেওয়ার নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান উভয় জনগোষ্ঠীর মানুষ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাচ্ছেন। সব দেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতাবোধ কাজ করে। সরকার ও বৃহত্তর সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে সেই নিরাপত্তাহীনতাবোধ যতটা সম্ভব দূর করার চেষ্টা করা। সরকার আগের অনেক ঘটনার বিচার করেনি, করলে হয়তো কিছু ঘটনা এড়ানো যেত। সরকার চুপ থাকার কারণেই কুচক্রীমহল হিন্দুদের টার্গেট করে তাঁদের দেশ ত্যাগ করাতে সাহস পাচ্ছে। দেখা গেছে কোনো সরকারই হিন্দু স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়নি, এমনকী দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করে না।

সাম্প্রতিক হিন্দু বিরোধিতা অতি মাত্রায় বেড়েছে। একটি মোল্লাবাদী ইসলামিক সংগঠন হিন্দুদের দোকানে আহার না করার ফতোয়া জারি করে রেখেছে। বিভিন্ন সময়ে ইসলামি জলসায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য দেওয়া হয় সেটা আরও ভয়ংকর হতে পারে বলে বুদ্ধিমান মানুষেরা মনে করেন।

বাস্তবতার নিরিখে এখন দিনের আলোর মতো সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। দেশটিতে হিন্দুদের জীবন, সম্পত্তি ও সম্পদ এখন সুরক্ষিত নয়। এই দায় এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এখনো এ কলঙ্ক হতে দেশটি রক্ষা পেতে পারে। সেজন্যে চাই সরকারের সাহসী ভূমিকা। □

With Best Compliments -

A
Well Wisher

কংগ্রেস ও বামপন্থী নির্বাচনী আঁতাত তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

অমিত কুমার চৌধুরী

কিছুদিন আগে কয়েকজন বামপন্থী কমরেড আমাকে কংগ্রেস ও বামপন্থী জোটের প্রার্থীকে লোকসভায় ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে বলেছিলেন, কেন্দ্রের এই ফ্যাসিস্ট ও সাম্প্রদায়িক বিজেপি সরকারকে দেশের স্বার্থে হারাতে হবে, না হলে সমূহ বিপদ। আমি তাদের বিনম্রতার সঙ্গে বলেছিলাম, ফ্যাসিস্ট ও সাম্প্রদায়িক কাকে বলে একটু দয়া করে বলবেন? তারা তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী সেই গতানুগতিক কথা বললেন যে, বিজেপি দেশের সব প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগত করছে, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে, মোদী ভীষণ স্বৈরতন্ত্রী, দেশে হিন্দু মুসলমান বিভাজননের রাজনীতি করছে, তারা দলিত বিরোধী, নারী বিরোধী ইত্যাদি। কিন্তু অদ্ভুতভাবে মোদী বা বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ করলেন না।

এই অভিযোগ শোনার পর উত্তরে আমি তাদের বলি, ১৯৫৭ সালে ভারতে প্রথম অকংগ্রেসি সরকার গঠন করে সিপিএম নেতা, এলামকুলাম মানাক্কাল শঙ্করন নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কেরালায়। নেহরু তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী, যিনি সোভিয়েত পন্থী, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়া নেতা এবং অবশ্যই গণতান্ত্রিক, সেই নেহরুই ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে স্বাধীন ভারতে প্রথম এক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বামপন্থী সরকারকে ফেলে দিয়েছিলেন।

তারপরেও দেশবাসী দেখেছে 'বাপ কী বেটি' শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্পূর্ণ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করে সমস্ত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেছিলেন। সব বিরোধী নেতাকে জেলে পুরেছিলেন। অবশ্য সেই সময় কোনো সিপিএম নেতা জেলে ঢোকেনি বা এতবড়ো গণতন্ত্র হত্যাকারী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন গড়ে তোলেনি। ব্যতিক্রম, ডায়মন্ড হারবার থেকে সিপিএমের নির্বাচিত জ্ঞানী ও যোগ্য সাংসদ স্বর্গত জ্যোতির্ময় বসু, যিনি ইন্দিরার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বলে তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল।

সেই সময় ইন্দিরার স্বৈরতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক মনোভাব এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের তিনি বাড়ির চাকর মনে করতেন। এইবেলা পদে থাকলে ওইবেলা থাকবেন কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। রাজনৈতিক জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে তিনি নিজেকে ভীষণভাবে অগণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী প্রমাণ করে কলঙ্কিত করেছেন। ১৯৮৩ সালে তিনি কাশ্মীরে ফারুক আবদুল্লা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের এনটি রামা রাওয়ের নির্বাচিত সরকারকে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে অন্যায় ভাবে ফেলে দিয়েছিলেন। তখন আমি চাকরি সূত্রে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে দেখেছিলাম সিপিএমকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে।

সিপিএমের মুখ্য নেতারা সব ওপার বাংলা থেকে নিজেদের ধর্ম রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এলেন। মার্কসবাদ তো কোনো সংকীর্ণ চিন্তা নয় বলে দাবি করেন কমরেডরা। ওটা তো বিশ্ব চিন্তা, মানবতাবাদী চিন্তা। তাহলে কমরেড, ওপার বাংলায় মার্কসবাদ মুখ থুবড়ে পড়ল কেন?

বিজেপির অটলবিহারী বাজপেয়ী দেশে ছয় বছর দেশ শাসন করেছেন। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবার বামফ্রন্ট সরকারকে ফেলার জন্য বাজপেয়ীকে চাপ দিতেন কিন্তু বিজেপি ছয় বছরের রাজত্বে কোনো সরকারকে না ফেলে গণতন্ত্র ও সংবিধানের প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন। এখন নরেন্দ্র মোদীর (বাজপেয়ী তো উদারবাদী আর মোদী তো ভীষণ স্বৈরতন্ত্রী ও কট্টর, অবশ্যই বামেদের মতে) দশ বছর শাসনে তিনিও একটিও নির্বাচিত সরকারকে সংবিধান পদদলিত করে ফেলে দেননি। পুনরায় বামপন্থী বন্ধুদের প্রশ্ন করলাম, এরপরও আপনারা বলবেন কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ও বিজেপি ফ্যাসিস্ট!

মুসলিম লিগ এদেশকে নিজের দেশ মনে করেনি। তারা নিজেদের পৃথক জাতি মনে করতো বলে পাকিস্তানের দাবি তোলে। গান্ধীজীর উদারনীতি ব্যর্থ হওয়া, নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ, জিন্নার হিন্দু বিরোধী জেহাদি মনোভাব দেশ বিভাজনকে

অনিবার্য করে তুলেছিল। আর তাকে তাত্ত্বিক ভাবে সমর্থন করেছিল কমিউনিস্টরা। তারা মুসলিম লিগের চাঁদতারা পতাকা আর কাস্তে হাতুড়ি লাল পতাকা একসঙ্গে লাগিয়ে দাবি তুলেছিল, পাকিস্তান মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে। যে সব হিন্দু কমিউনিস্ট নেতা এই দাবি তুলেছিল তাদেরও সেই পবিত্রস্থানে স্থান দেয়নি মুসলমানরা। নাম্বুদ্রিপাদ সেই সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগের সঙ্গে কেরালায় সরকার গঠন করেছিলেন। সিপিএমের কাছে মুসলিম লিগ, পিএফআই, সিমি, আসাদউদ্দিনের দল এবং আইএসএফ যা নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িক দল, তারা বন্ধু, দেশহিতৈষী আর বিজেপি ও আরএসএস সাম্প্রদায়িক!

কী বলেন কমরেড? সিপিএমের মুখ্য নেতারা সব ওপার বাংলা থেকে নিজেদের ধর্ম রক্ষার জন্য পশ্চিম বঙ্গে পালিয়ে এলেন। মার্কসবাদ তো কোনো সংকীর্ণ চিন্তা নয় বলে দাবি করেন কমরেডরা। ওটা তো বিশ্ব চিন্তা, মানবতাবাদী চিন্তা। তাহলে কমরেড, ওপার বাংলায় মার্কসবাদ মুখ থুবড়ে পড়ল কেন? মার্কসবাদ প্রয়োগ করার জন্য হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসা কেন? কমরেড মণি সিংহ যিনি জ্যোতি বসুর থেকেও দশ বছরের বড়ো ছিলেন, দেশ ভাগের পরও পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে ভারতে আসেননি। তার নামে ঢাকায় একটা রাস্তা ছিল। সেখানকার ধর্মান্ধ কিছু মুসলমান দাবি তুলেছিল যে মণি সিংহের নামে রাস্তা থাকবে না। কারণ তিনি হিন্দু কাফের ও ধর্মবিরোধী কমিউনিস্ট। এক কমিউনিস্ট নেতা রনেন সেনকে ওপার বাংলায় প্রকাশ্য রাস্তায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হলেও এই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা ব্লক ভোট হারাবার ভয়ে কোনো প্রতিবাদ করেননি।

জ্যোতি বসুর বাড়ি ঢাকায়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাড়ি ফরিদপুর। প্রশান্ত সুরের বাড়ি নোয়াখালি। শৈলেন সরকারের ও মানব মুখার্জির বাড়ি বরিশাল। যাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাঁরা ওখানে থাকতে পড়লেন না এই পশ্চিমবঙ্গেও তাদের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে এখান থেকেও কমরেডদের পালাতে হবে মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য। তখন কোথায় যাবেন কমরেড? আসলে আপনাদের দর্শনে ভারত নেই, নেই ভারতের আত্মা, আছে রাশিয়া, চীন। তাই আপনাদের পার্টির নাম ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি না হয়ে, হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া যা আন্তর্জাতিক কৌমের অংশ। এই জন্যই ভারতের থেকে আপনাদের চীন, রাশিয়ার প্রতি এত দরদ। সেই মতাদর্শের গোঁড়ামিতে বুঁদ হয়ে কমরেডরা বলেন, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। চীন ভারত আক্রমণ করলে বলেন, চীন না, ভারতই প্রথমে আক্রমণ করেছে। সেই সময় কমরেডদের প্রতি দেশবাসীর ঘৃণা এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যে, কেউ কেউ বলতো, যেমন, কানা কে কানা বলতে নেই, তেমন কমিউনিস্টকে কমিউনিস্ট বলতে নেই।

শেষে আবার কমরেডদের উদ্দেশে বললাম। আপনাদের নির্বাচনী ইস্তেহার দেখলাম তাতে আপনারা বেসরকারি সংস্থায় এসসি, এসটি, ওবিসি সংরক্ষণ চান। খুব ভালো কথা, সাধুবাদ জানাই। কিন্তু ইস্তেহারে এটাও লেখা আছে কমরেড যে আপনারা ক্ষমতায় এলে কাশ্মীরে ৩৭০ ও ৩৫-এ ফিরিয়ে আনবেন, যা কোনোদিনই পারবেন না। এই ধারা থাকার ফলে সাধারণ কাশ্মীরবাসীর কোনো উন্নতি হয়নি। শুধু দুই পরিবার আবদুল্লা ও মুফতি পরিবার উপকৃত হয়েছে। আর নিরীহ হিন্দুদের উপত্যকায় হত্যা করা হয়েছে এবং বিতাড়িত করে হয়েছে। যে সেনারা কাশ্মীরকে রক্ষা করছে তাদের উদ্দেশে টাকার বিনিময়ে পাথর ছোড়া হতো। ওমর আবদুল্লা তো বলেছিলেন ৩৭০ ধারা না থাকলে কাশ্মীর ভারতে থাকবে না। আর এখন পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতে যোগ দিতে চাইছে। এই ধারা ছিল বলেই তো কোনো এসসি, এসটি ওবিসি লোকেরা কোনো সংরক্ষণ পেতো না কাশ্মীরে। মোদী তো সেই পিছিয়ে পড়া মানুষদের উপকার করেছেন, আর আপনারা সেটা কেড়ে নেবেন ৩৭০ ধার ফিরিয়ে এনে? এ কেমন গরিব দরদ কমরেড আপনাদের? এই ধারা থাকার জন্যই কাশ্মীরের কোনো নারী অকাশ্মীরি যুবককে বিয়ে করলে তার সব অধিকার থেকে সেই নারী বঞ্চিত হতো। আপনাদের চোখে বিজেপি নারী বিরোধী। এটা কি নারী বিরোধী নয়? তিন তালাকের মতো অমানবিক নারী নির্যাতনকারী কুপ্রথা রদ করে মোদীর দল নারী বিরোধী আর আপনারা প্রগতিশীল? আমি আরও বলি, কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের এই নির্বাচনী আঁতাত আপনাদের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাই বলি কমরেড, ভারতকে, ভারতের সমাজকে, তার ধর্ম সংস্কৃতিকে বোঝার চেষ্টা করুন। নতুবা বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখা কমিউনিস্টরা ভারত তথা বিশ্ব থেকে মুছে যাবে। তাই পশ্চিমবঙ্গে শূন্য আসন পেয়ে আপনাদের কমরেড তন্ময় ভট্টাচার্যের মতে, জনগণ আমাদের হাতে একটা ফুটো বাটি ধরিয়ে দিয়েছে। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

Ganpati Sugar Industries Limited

Head Office
20B, Abdul Hamid Street
4th Floor, Kolkata - 700 069
Phone : 033-22483203
Fax : 033-22483195

Administrative Office
8-2-438/5, Road No. 4
BANJARA HILLS
Hyderabad - 500 034
040-2335215/213

Works
Village - Fasalwadi
Mandal Sangareddy
District - Medek
Andhra Pradesh

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট মিটিঙে বক্তব্য রাখছেন শ্যামাপ্রসাদ (১৯৪৯)।

শিক্ষাব্রতী ড. শ্যামাপ্রসাদ

ড. দিবাকর কুণ্ডু

অবিভক্ত বঙ্গে এমন কিছু মনীষী ঊনবিংশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যাঁদের উপস্থিতিতে বঙ্গে ও বাঙ্গালি হয়েছিল সমৃদ্ধ। এঁরাই হয়ে উঠেছিলেন বাঙ্গালি তথা ভারতবাসীর পথ প্রদর্শক। সে কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীকে আধুনিক বঙ্গের স্বর্ণযুগ বলা হয়। বিংশ শতাব্দীতে যে সব বাঙ্গালি শিক্ষাবিদ নিজস্ব প্রতিভাবলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকালীন স্থান লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গের বহু সুসন্তান সমগ্র ভারতে এবং কয়েকজন সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বজগতে তো দূরের কথা সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি বা মর্যাদা লাভ করিয়াছে এরূপ বাঙ্গালি নাই বলিলেই চলে। ইহার এক ব্যতিক্রম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।'

ড. শ্যামাপ্রসাদ ছাত্রজীবনেই তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল তারকা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। স্যার আশুতোষ আপন প্রতিভা ও মেধার বলে এই মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদও অলংকৃত করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরই সন্তান শ্যামাপ্রসাদও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে ড. শ্যামাপ্রসাদ ভালোভাবেই জানতেন যে দেশের শিক্ষার সার্থক ও সফল অগ্রগতি ঘটাতে গেলে শুধুমাত্র কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ছাত্র ভর্তি করলেই চলে না— এই শিক্ষাকে ফলপ্রদ করতে হলে যাঁরা শিক্ষকরূপে নির্বাচিত হবেন, তাঁদের হতে হবে উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত। তাই প্রয়োজন ছিল প্রকৃত শিক্ষক- শিক্ষণকেন্দ্রের। অথচ আমাদের দেশে তখনও অমন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। শ্যামাপ্রসাদই প্রথম এই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিষয়টি সিন্ডিকেটে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে ড. শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষাবিস্তার ক্ষেত্রে অন্য অনেক শিক্ষাবিদের তুলনায় অগ্রবর্তী চিন্তানায়ক ছিলেন।

মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে শিক্ষাবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ ভারতের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য নির্বাচিত হয়ে এক অনন্য নজির গড়েছেন, যা-সম্ভবত আজও অমলিন।

তিনিই প্রথম উপাচার্য যিনি কোনোরকম সংকীর্ণতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত মুসলমান ইতিহাস (ইসলামিক হিস্ট্রি) বিভাগ স্থাপন করে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকৃত সাক্ষ্য রাখেন। যাঁরা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করেন, তাঁরা প্রায়ই এই তথ্যটি বিস্মৃত হয়ে থাকেন।

১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভারতের কয়েকটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে যে সব সমাবর্তন ভাষণ দেন— সেগুলি সবই তাঁর মৌলিক চিন্তার বাহন।

আমরা যদি তাঁর প্রদত্ত এই সব সমাবর্তন ভাষণ একটু সতর্কভাবে অনুসরণ করি, তাহলে দেখব তাঁর শিক্ষা-চিন্তা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সাধনে কতখানি সফল ছিল।

শিক্ষাবিদ, চিন্তানায়ক, উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ তাঁর প্রথম সমাবর্তন ভাষণ দেন ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে। আর শিক্ষাবিদ হিসাবে শেষ ভাষণ দেন ১৯৫২ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। দিল্লির এই সমাবর্তন ভাষণটি স্বাধীন ভারতে প্রদত্ত একমাত্র ভাষণ, বাকিগুলো সবই পরাধীন ভারতে প্রদত্ত। তিনি তাঁর যুক্তির মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার শাসিত শিক্ষাব্যবস্থার নানা ত্রুটির দিক উদ্‌ঘাটিত করে, কীভাবে আমাদের দেশের শিক্ষা অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন তা স্পষ্ট করে তুলেছিলেন এবং ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাধারা যে কখনই আমাদের দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ ঘটাতে পারে না, তা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম সিদ্ধান্তগুলি হলো—

(ক) মাতৃভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে পঠনপাঠন ও পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা; সুসংবদ্ধ বাংলা বানান পদ্ধতি নির্ধারণ; বৈজ্ঞানিক শব্দের বঙ্গ পরিভাষা রচনা।

(খ) প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ চর্চা ও গবেষণার জন্য আশুতোষ

মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা।

(গ) মহিলাদের জন্য গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠক্রমের সূচনা।

(ঘ) ছাত্রদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট।

(ঙ) ছাত্রদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে ইনফরমেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট বোর্ড স্থাপন।

(চ) শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষ করে তুলতে টিচার্স ট্রেনিং কোর্সের প্রবর্তন।

(ছ) ছাত্রদের সামরিক শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে মিলিটারি স্টাডিজের ব্যবস্থা।

(জ) ফলিত পদার্থবিদ্যায় কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (এখনকার ইনফরমেশন টেকনোলজি) পাঠক্রম চালু করা।

(ঝ) ম্যাট্রিকুলেশন থেকে এম.এ. পর্যন্ত ভূগোল পড়াবার ব্যবস্থা।

(ঞ) কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের ব্যবস্থা।

(ট) মুসলিম হিস্ট্রি এবং সংস্কৃত চর্চার উদ্দেশ্যে নতুন বিভাগের পরিকল্পনা।

ড. শ্যামাপ্রসাদ উপলব্ধি করেছিলেন প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষাপ্রবাহ যদি কোনও স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে শিক্ষা শুধু তার গুরুত্বই হারাবে না, তা হবে অসম্পূর্ণ। এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় সরকারের ভূমিকার গুরুত্ব স্মরণ করে তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন— 'এই সরকার তার শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলো যন্ত্র সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তাই তারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেনি। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন— এই তিন শ্রেণীর শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে রাখার ফলে একটির ক্ষতি করে অন্য একটির উন্নতির পরিকল্পনার কথা শোনা যায়।' এই চিন্তাধারা যে ভ্রান্ত তা তিনি বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করে বলেন— 'আমরা জাতীয় শিক্ষার এমন একটি সুস্থ নীতি প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই যা সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে। আমরা দেখতে পাই যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছে এবং জনগণকে সৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে সৎকাজে প্রণোদিত করে এবং তাদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী করে তাদের অন্তরে জাতীয়তাবোধের ভিত্তি স্থাপন করেছে।'

এইখানেই তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেননি, তিনি আরও বলেছেন— 'আমরা দেখতে চাই যে মাধ্যমিক শিক্ষা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন ধারায় প্রকৃত শিক্ষা দেবার উপযুক্ততা অর্জন করেছে। এবং শিক্ষাপ্রাপ্তদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধিজনিত, হিতকর ও উৎপাদনশীল কাজের সন্ধান দিচ্ছে। সব শেষে আমরা দেখতে চাই যে বিভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় ওই সব শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে উচ্চস্তরের শিক্ষাদান করছে।'

১৯৪৩ সালে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে ড. শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক নয়, এর মধ্যে তিনি দেখতে পাননি জাতীয় শিক্ষার কোনও সুষ্ঠু নীতি। তাই তিনি বারবার জাতীয় শিক্ষানীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, 'আমরা জাতীয় শিক্ষার এমন একটি সুষ্ঠু নীতি প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই যা সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে।' তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পৌঁছে এই শিক্ষা এক সর্বব্যাপী রূপ লাভ করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার যে একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে এবং এই শিক্ষাব্যবস্থা যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হওয়া দরকার— তিনি তারও উল্লেখ করেছেন। তিনি ভারতীয় নারীত্বের শাশ্বত রূপটি অপরিবর্তিত রাখার উদ্দেশ্যেই নারী সমাজকে তাদের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই যোগ্য করে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিভাষা সূত্রকেই প্রধান্য দিয়েছেন। প্রথমটি আঞ্চলিক ভাষা যা মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষা; দ্বিতীয়টি জাতীয় ভাষা (ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ), যা মূলত ভারতের সর্বত্র যোগাযোগ রক্ষা করার ভাষা। একে রাষ্ট্রভাষা বলেও চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে হিন্দি ভাষাই হলো শিক্ষণীয়; আর তৃতীয়টি হলো আন্তর্জাতিক ভাষা (ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ) যা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য জরুরি, তা হলো ইংরেজি ভাষা। ইংরাজি ভাষাকে শাসক ব্রিটিশদের ভাষা বলে উপেক্ষা করাকে তিনি, অদূরদর্শিতা বলেই বিবেচনা করেছেন। তবে এই সঙ্গে তিনি বিস্মৃত হননি ভারতের প্রাচীনতম সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। কেননা তিনি ভালোভাবেই জানতেন ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, কলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি অজস্র মণিমুক্তা রক্ষিত আছে এই ভাষাভাণ্ডারে। তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করতেন এই ভাষাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। শিক্ষাব্রতী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন— 'একটি জাতির জীবন অথবা মৃত্যু নির্ভর করে মানুষের চরিত্রের ওপর। সম্পদ, অস্ত্র, সামরিক ভাণ্ডার, সুসংবদ্ধ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী জাঁকজমক বাড়ায়, কিন্তু মানুষের চরিত্র, যার মধ্যে দিয়ে যুবসমাজ গড়ে ওঠে, তারই উপরই নির্ভর করে জাতির জীবন ও মৃত্যু।'

তাই তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল লক্ষ্যটি যে আদর্শবান, চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলা তা সন্দেহাতীত। প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা দেখব, ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অবস্থিত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে এই কথাগুলি বলে শেষ করেছিলেন তাঁর ভাষণ।

"With our ancient heritage, with the spirit of India still ennobling the mind of man, with our vast resources of manpower and buried wealth, with our undoubted capacity of assimilation of new ideas, let us, irrespective of all differences, make supreme co-operative effort to raise our motherland to a higher and a nobler life of existence, bringing joy and contentment to all, making her a highty instrument for the maintenance of world peace and freedom."

১৯৫৩ সালে এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তাঁর মৃত্যুর কাল পর্যন্ত তিনি যে শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত ও শিক্ষা-চিন্তায় অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন, তার সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করছে।

(পুনঃপ্রকাশিত)

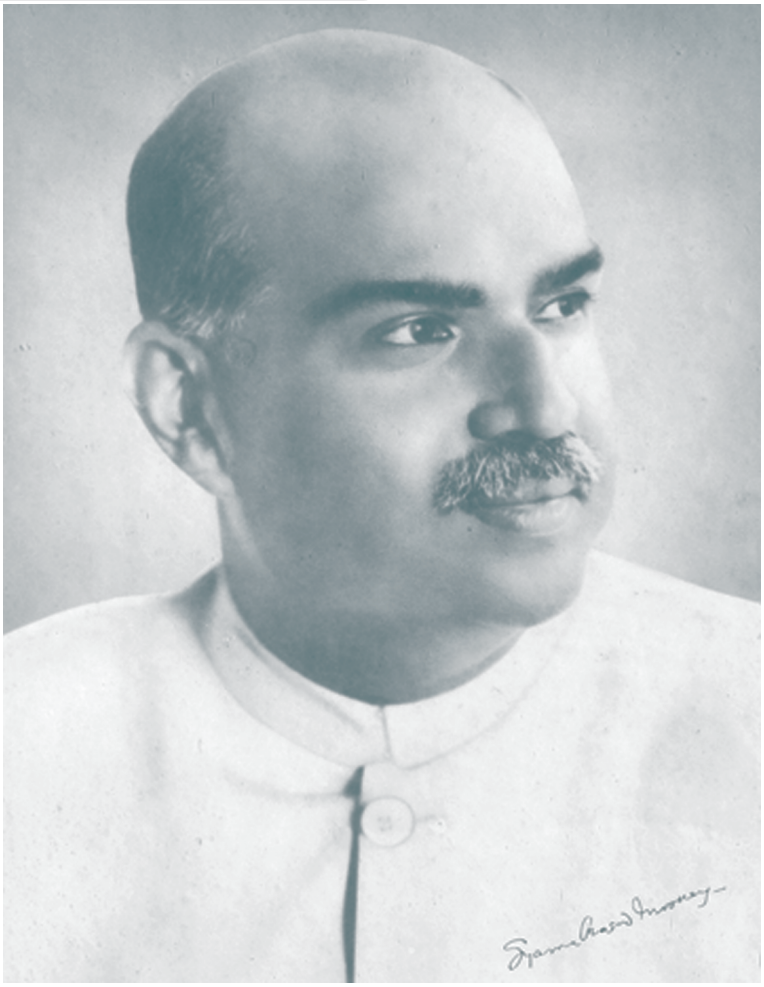

‘ওই টাকমাথা ভদ্রলোক কে যেন?’

তথাগত রায়

এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন একজন বিজেপি-অনুরাগী যুবক, বিজেপির সক্রিয় সদস্যা শতরূপাকে। শতরূপা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তাকে বলেছিলেন, ‘ছি ছি, কী লজ্জার কথা! আপনি শ্যামাপ্রসাদকে চেনেন না! যাঁর জন্য এই পশ্চিমবঙ্গে আছেন তাঁরই পরিচয় জানেন না? শতরূপা পরে এই ঘটনাটি আমাকে, কিঞ্চিৎ উত্তেজনা প্রশমনের পর জানালে আমি বলেছিলাম যুবকটির দোষ নেই, তোমারও এই পরিমাণ উত্তেজিত হওয়া ঠিক হয়নি। আমরা রাজনৈতিক দল, আমরা যদি জনসাধারণের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছোতে না পারি তাহলে দোষ আমাদেরই, জনসাধারণের নয়। আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি না যে কমিউনিস্টরা, বা তাদের পৃষ্ঠপোষক কংগ্রেসীরা শ্যামাপ্রসাদের মহত্ত্বের কথা মানুষকে জানাবে— বরঞ্চ এটাই আশঙ্কা করতে পারি যে তারা নিজেদের কুকীর্তি গোপন করার উদ্দেশ্যে ঘটনা লুকিয়ে রাখবে। এই প্রসঙ্গে ফিরে আসব এই নিবন্ধের একেবারে শেষে।

শ্যামাপ্রসাদ, বলা যেতে পারে এককভাবে, পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন। এবং এই ব্যাপারে তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের নীরব সহযোগিতা পেয়েছিলেন, কারণ রাজ্য কংগ্রেসের একটি অংশ, কিরণশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে এর বিরোধিতা করেছিল। অপরপক্ষে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস থেকে তিনি যাঁর এক হাজার শতাংশ সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁর নাম সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। ভারতের লৌহমানব নামে যাঁর সমধিক পরিচিতি। অপরপক্ষে গান্ধীজী এবং নেহরু এ ব্যাপারে খানিকটা দোলাচল মনোবৃত্তি দেখিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির জন্য যাঁদের বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদকে লড়তে হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য, অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে, নেতাজী অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু। এর প্রধান সহযোগী ছিলেন মুসলিম লিগের আবুল হাশিম এবং পিছনে প্রধান শক্তি ছিলেন কলকাতার দাঙ্গার স্রষ্টা হুসেন সাইদ সোহরাওয়ার্দি। আজকের প্রজন্ম যেহেতু এই নামগুলির সঙ্গে পরিচিত নয়, সেজন্য এই ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্তভাবে একটু বলা দরকার।

১৯৪৫ সালে ব্রিটেনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় এবং শ্রমিক দলের ক্ষমতায় আসার পরে নতুন প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলি সিদ্ধান্ত করেন যে ভারতকে যথাশীঘ্র স্বাধীনতা দিতে হবে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন কাকে? দেশ তখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আছে—সমস্ত হিন্দুর আগ্রহ দেশ অবিভক্ত থাকুক, যার প্রতিভূ ছিল কংগ্রেস; এবং সমস্ত মুসলমানের (হ্যাঁ, এটাই সত্য, পরবর্তীকালে যারা ভারত ছেড়ে যায়নি তাদেরও) আগ্রহ ভারতভাগ হোক, পাকিস্তান তৈরি হোক, যার প্রতিভূ ছিল মুসলিম লিগ। তখন ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমান আলাদা আলাদা ভোট দিত! এবং ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে দেশ এইভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

পথনির্দেশের জন্য অ্যাটলি ভারতে একটি উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন দল পাঠালেন, যার নাম ক্যাবিনেট মিশন। এই ক্যাবিনেট মিশনের প্রধান ছিলেন পেথিক লরেন্স এবং অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ এবং ভাইকাউন্ট অ্যালেকজান্ডার— এঁরা কেউই ভারত- বিরোধী ছিলেন না। এঁরা কংগ্রেস, লিগ, হিন্দু মহাসভা, অকালি ইত্যাদি

ফঃ ৩

নেতৃত্বের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা করলেন, যার নাম ছিল 'গ্রুপিং প্ল্যান'। এই পরিকল্পনা কংগ্রেসও মেনে নেয়, লিগও খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নেয়; এবং এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে ভারত অখণ্ড থাকত। কিন্তু জওহরলাল নেহরু, যিনি তখন সদ্য মৌলানা আজাদের কাছ থেকে কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, ১০ জুলাই ১৯৪৬ তারিখে কারুর সঙ্গে আলোচনা না করে বম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) এক বিস্ময়কর বিবৃতি দিয়ে বসেন। মৌলানা আজাদ এই বিবৃতিকে বলেছেন, 'সেই সব দুঃখজনক ঘটনা'র একটি যা ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয়। এই বিবৃতিতে পণ্ডিতজী তার পাণ্ডিত্য ফলিয়ে (উদ্দেশ্য আরও নিগূঢ় ছিল, কিন্তু সে আলোচনা এখানে নয়) কার্যত ঘোষণা করেছেন যে কংগ্রেস 'গ্রুপিং প্ল্যান' গ্রহণ করা থেকে পিছু হঠছে।

এরপর আর জিন্নাকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লিগের তরফ থেকে 'গ্রুপিং প্ল্যান' প্রত্যাখ্যান করেন এবং ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ডাক দেন। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বাস্তবে কলকাতা দাঙ্গার চেহারা নিল, যাতে ৪ দিনে আনুমানিক ১৭,০০০ মানুষ নিহত হন। আশ্চর্যের বিষয়, পাছে কেউ তাদের 'মুসলমান-বিরোধী' বলে সেই ভয়ে গান্ধী ও নেহরু কলকাতায় এলেনই না। এদিকে কলকাতার দাঙ্গার পরে নোয়াখালির হিন্দুহত্যা আরম্ভ হলো এবং তার প্রতিবাদে বিহারে দাঙ্গা হলো। এই সবের ফলে ভারত ভাগের পথ প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হতে থাকল।

১৯৪০ সালে যখন মুসলিম লিগ লাহোরে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' পাশ করেছিল তখন কংগ্রেস কিন্তু তার প্রতিবাদ করেনি— করেছিল একমাত্র সাভারকর ও শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ তাঁর গভীর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ১৯৪৬ সালের শেষের দিকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশভাগ ঠেকানো যাবে না। তখন তিনি বহুপরিচিত আপ্তবাক্য 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' সম্বল করে উদ্যোগী হলেন বাঙ্গালি হিন্দুর বাসভূমি তৈরি করার জন্য। জিন্নার মতলব ছিল সামান্য মুসলিম সংখ্যাধিক্যসম্পন্ন বঙ্গকে (হিন্দু : মুসলমান :: ৪৭ : ৫৩) পুরোপুরি পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দেওয়া।

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে ওয়াভেল-কে সরিয়ে মাউন্টব্যাটেন বড়লাটের পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। জিন্না তাঁর কাছে প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে দাবি করতে শুরু করে দিলেন যে বঙ্গ ও পাঞ্জাবকে কিছুতেই ভাগ করা যাবে না, কারণ একজন মানুষ তাঁর মতে নাকি, 'আগে বাঙ্গালি বা পাঞ্জাবি, তার পরে হিন্দু বা মুসলমান'। এর উত্তরে মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন 'একদম ঠিক'। জিন্না একটু আশ্চর্য হয়ে বলেছেন, 'আপনি মেনে নিচ্ছেন তো'? উত্তরে মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, 'একজন মানুষ আগে ভারতীয় তারপর হিন্দু বা মুসলমান। আপনি দেশভাগ না করার সপক্ষে অকাট্য যুক্তি দিয়েছেন'। উত্তরে জিন্না হাত পা ছুঁড়ে বলছেন, 'না, না, আপনি ব্যাপারটা বুঝতেই পারেননি'। জিন্নার চ্যালা লিয়াকত আলি খানও একই কথা বলতেন।

কিন্তু এইসব কথার ফাঁকে ফাঁকে যখন জিন্না বুঝলেন তিনি দেশভাগ চাইলে পুরো বঙ্গ কিছুতেই পাবেন না, তখন এক উলটো চাল চাললেন। আর এক চেলা, কলকাতায় দাঙ্গার হোতা সোহরাওয়ার্দিকে উস্কে দিলেন। সোহরাওয়ার্দি ঘোষণা করলেন তিনি বঙ্গ ভাগ নয়, 'স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গ চান', অর্থাৎ বঙ্গ ভারতেও থাকবে না, পাকিস্তানেও না, একটি স্বাধীন দেশ হবে। জিন্না, যেন কিছুই জানেন না এইভাবে, বললেন, 'বাঃ, এ তো উত্তম প্রস্তাব! কলকাতা ছাড়া বঙ্গে আছেটা কী? যদি স্বাধীন বঙ্গ হয় তা হলে তারা পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন একটি দেশই হবে, ভালই হবে"।

অতি দুঃখের বিষয়, এই দাবির সপক্ষে সোহরাওয়ার্দি পেয়ে গেলেন কিরণশঙ্কর রায় ও নেতাজী-অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে। এঁরা তখন দুজনেই শ্রান্ত, পরাজিত সৈনিক। ১৯৩৯ সালে যখন সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন তখন বাংলায় কার্যত কংগ্রেস দুভাগ হয়ে গিয়েছিল, একটির নেতৃত্বে ছিলেন শরৎচন্দ্র, অন্যটিতে কিরণশঙ্কর। কিন্তু ১৯৪৬ সালে জল অনেক গড়িয়ে গিয়েছে, কংগ্রেস পুরোপুরি গান্ধীপন্থী, নেতৃত্ব ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এবং নলিনীরঞ্জন সরকারের কব্জায়। সম্ভবত শরৎচন্দ্র-কিরণশঙ্কররা হৃতগৌরব আবার ফিরে পারার চেষ্টা করছিলেন। এই কাজে শামিল হয়েছিলেন বঙ্গর শেষ ব্রিটিশ ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক বারোজ ও। তিনি আবার কলকাতাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব ডান্‌জিগ-এর আদলে 'আন্তর্জাতিক মুক্ত বন্দর' বানাতে চাইছিলেন।

শরৎ বসু এবং বর্ধমান জেলার মুসলিম লিগ নেতা আবুল হাশিম তড়িঘড়ি একটা 'অস্থায়ী সংবিধান'ও লিখে ফেললেন 'স্বাধীন বঙ্গের জন্য'। তাতে ছিল স্থায়ী সংবিধান প্রণয়ন করবে ৩০ জনের একটি কমিটি, তাতে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন। আরও এরকম নানা বিধান ছিল। এই অস্থায়ী সংবিধানটি তাঁরা পাঠালেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে, মতামতের জন্য। উল্লেখ্য, গান্ধীজী কিন্তু এক কথায় এটিকে খারিজ করে দেননি। দিয়েছিলেন একমাত্র সর্দার প্যাটেল। অত্যন্ত কড়া ভাষায় তিনি শরৎচন্দ্র বসুকে লিখলেন, ''আমি দেখছি তুমি ভারতীয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছ!'

গান্ধীজী পরে সোহরাওয়ার্দিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ''তুমি কি এই অঙ্গীকার তোমার সংবিধানে ঢোকাতে পার যে এই দেশ কখনই পাকিস্তানে যোগ দেবে না?" সোহরাওয়ার্দি জবাব দিতে পারেননি। সোহরাওয়ার্দির এর পিছনে, জিন্নার উসকানি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গীয়, মেদিনীপুরের আশরাফ (সম্ভ্রান্ত) মুসলমান পরিবারের সন্তান, পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম নেতাদের কাছে কতটা পাত্তা পাবেন সে সম্বন্ধে তাঁর গভীর সন্দেহ ছিল। আরও গূঢ় কারণ হচ্ছে, সোহরাওয়ার্দি ছিলেন একজন নটবর নাগরও। কলকাতায় তাঁর প্রচুর বেনামি সম্পত্তি ছাড়াও বেশ কিছু রক্ষিতা ছিলেন। তার মধ্যে একজন আবার এক অগ্রগণ্য হিন্দু চিত্রাভিনেত্রী। কিন্তু যাক্ সে কথা। এই সব

কারণে দেশভাগ হবার পরেও ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭ তারিখে সোহরাওয়ার্দি ঢাকায় যাননি, গান্ধীজীর কোঁচা ধরে কলকাতাতেই পড়ে ছিলেন, সম্পত্তি ও রক্ষিতাদের বিলি-বন্দোবস্ত করে তবে পরের বছর ঢাকা যান।

যাইহোক, এই সব কুকীর্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্যামাপ্রসাদ ১১ মে ১৯৪৭ তারিখে নেহরু ও প্যাটেলকে এক চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেন যে সোহরাওয়ার্দি, শরৎ বসু এবং হাশিম-এর কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তিনি আরও লেখেন যে এই পরিকল্পনার সপক্ষে হিন্দুদের সমর্থন নেই বললেই হয় এবং শরৎচন্দ্র বসুর বর্তমান রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা এতই তলানিতে যে তিনি আজকাল কোনও সভাসমিতিতেও বক্তৃতা করেন না। বস্তুত এই প্রক্রিয়াটা আরম্ভ হয়েছিল ২২ নভেম্বর ১৯৪৫ তারিখে যখন পুলিশের গুলিতে ধর্মতলায় রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ছাত্রের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও এবং ছাত্রদের আকুল মিনতি সত্ত্বেও তিনি সেখানে যাননি, উলটে ছাত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন মৃতদেহ পুলিশের হেপাজতে রেখে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য। এই চিঠির উত্তরে যথারীতি গান্ধীজী ও নেহরু কোনও মতামত জানালেন না, তানানানা করে একটা উত্তর দিলেন। প্রত্যাশিতভাবেই প্রতিক্রিয়া জানালেন একমাত্র সর্দার প্যাটেল, লিখলেন যতদিন বঙ্গে হিন্দু জনসাধারণ এই শয়তানি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আছেন ততদিন আপনার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই এবং কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস রাখতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে শরৎ বসু ও কিরণশঙ্কর রায়কেও প্যাটেল কড়া ভাষায় এই নিয়ে আর নাড়াচাড়া করতে বারণ করলেন।

কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে নিজের মতে আনার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গ জুড়ে বঙ্গ ভাগের সপক্ষে প্রচারাভিযান শুরু করলেন। শরৎ বসু ও আবুল হাশিম কিন্তু থামেননি, নিজেদের প্রচারও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের অনুসূচিত জাতির নেতা বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলও, যিনি এই বঙ্গ ভাগের মধ্যে 'উচ্চবর্ণের' হিন্দুর আধিপত্যের ছায়া দেখেছিলেন। ভাগ্যের এমনই পরিহাস, যে দেশভাগ হবার পর যোগেনবাবু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন, ১৯৫০-এর হিন্দুহত্যার সময় পূর্ব-পাকিস্তানে পরিস্থিতি দেখতে আসেন এবং করাচী (তদানীন্তন পাকিস্তানের রাজধানী) ফিরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের কাছে নালিশ করেন। উত্তরে লিয়াকত ওঁকে জানান যে উনি বাড়াবাড়ি করছেন। এবং আরও বাড়াবাড়ি করলে ওঁকে গারদে ভরে দেওয়া হবে। এরপর যোগেনবাবু চোরাপথে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসেন এবং সেই শ্যামাপ্রসাদের সাহায্য নিয়েই নিজের পদত্যাগপত্র লিয়াকত আলির কাছে পাঠিয়ে দেন। ১৯৫০-এর বীভৎসতার ব্যাপারে যোগেন মণ্ডলের পদত্যাগপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এটি একটি চটি বই আকারে 'বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র' প্রকাশ করেছে এবং এই নিবন্ধকারের A Suppressed Chapter in History (পূর্ব নাম My People, Uprooted) বইতে এটি সংযোজিত হয়েছে।

শরৎ বসু, আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দির পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য শ্যামাপ্রসাদ তখন নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এই পরিশ্রমের ফলেই তিনি বঙ্গের হিন্দু জনমতকে সংগঠিত করতে পারলেন এবং ১৯৪৭ সালের মে মাসে অমৃতবাজার পত্রিকার একটি সমীক্ষায় বেরোল যে বঙ্গের ৯৭ শতাংশ হিন্দু বাংলা ভাগ চান। সব দুশ্চিন্তার অবসান হলো যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অ্যাটলি ৩ জুন ১৯৪৭ তারিখে একটি ঘোষণা দাখিল করে বললেন যে ভারতকে ভাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ এবং পাঞ্জাব প্রদেশকেও ভাগ করা হবে। তারপর ২০ জুন বঙ্গ আইনসভা (বর্তমানের বিধানসভা) বঙ্গ ভাগ বিষয়ক প্রস্তাব পাশ করল এবং সব জল্পনার অবসান হলো।

আজকাল রাজনৈতিক এবং অন্যান্য বিশ্লেষণ 'What if' ব্যাপারটা করা হয়ে থাকে— এর মানে, যদি এই না হয়ে এই হতো তা হলে কী হতো? যদি পুরো বাংলা পাকিস্তানে চলে যেত অথবা মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ 'স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গ' গঠিত হতো তা হলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের যা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেরও তাই-ই হতো এবং তাদের পুনর্বাসন অন্য কোনও রাজ্য হয় দিতে রাজি হতো না, না হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও দিত। তার ফলে বঙ্গের সাড়ে তিন কোটি হিন্দুকে হয় পথের ভিখারি হতে হতো, না হলে ধর্মান্তরিত হতে হতো, আর না হলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে হতো আজকে সিন্ধি হিন্দুদের যা হয়েছে। কিন্তু সিন্ধিদের যে ব্যবসাবুদ্ধি, পরিশ্রম করার ও মানিয়ে নেবার ক্ষমতা আছে বাঙ্গালি হিন্দুদের তা নেই— ফলে অবস্থা সিন্ধিদের চেয়ে অনেকটাই খারাপ হোত।

এই অবস্থা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করেছেন, বাঙ্গালি হিন্দুকে মাথা উঁচু করে থাকবার জায়গা দিয়েছেন ওই টাকমাথা ভদ্রলোক। পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করেছেন, কলকাতায় আমরা আছি— সব কিছুর মূলেই ওই টাকমাথা ভদ্রলোক। সেইজন্যই তিনি নমস্য। এবং সেইজন্যই কংগ্রেসি-কমিউনিস্টরা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, বাঙ্গালি যাতে ওই টাকমাথা ভদ্রলোককে ভুলে যায়।

এবার আমাদের কিছু দায়িত্বের প্রশ্নে ফিরে আসি। কুকুরের কাজ কুকুর করেছে— কিন্তু আমাদের কি কর্তব্য নয় শ্যামাপ্রসাদকে বাঙ্গালির কাছে পরিচিত করা? আমরা যদি শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকি, জনসংযোগ না করি, প্রচারের পরিধি বাড়াবার চেষ্টা না করি তবে তো শ্যামাপ্রসাদ 'ওই টাকমাথা ভদ্রলোকটি'ই থেকে যাবেন। ▯

With Best Compliments -

A Well Wisher

With Best Compliments

From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street
4th Foor
Kolkata - 700 069
Phone : Nos. 22483203
Fax No. 22483195
Email : eita.cal@eitain.com

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAURELMF FINMART PVT. LTD.
(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY
(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001
Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৬-এর অগাস্টে মুসলিম লিগ গুন্ডাদের আক্রমণে কলকাতায় এবং অক্টোবরে নোয়াখালিতে হাজার হাজার হিন্দু হত্যা করা হয়, অজস্র হিন্দু মহিলা গণধর্ষিতা হন।

কলকাতা ও নোয়াখালির হিন্দুহত্যার অভিজ্ঞতা থেকে কলকাতার বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও শুভবুদ্ধিযুক্ত বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পারেন যে, হিন্দুরা শত চেষ্টা করলেও মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অসম্ভব বিশেষত যেখানে মুসলমানরাই দুই বঙ্গ মিলিয়ে সংখ্যাগুরু। মুসলিম লিগ নেতৃত্ব প্রথমে কলকাতা-সহ সমগ্র বঙ্গকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। কংগ্রেসি নেতৃত্বও এই বিষয়ে কিছু মনঃস্থির করতে পারছিলেন না। কিন্তু পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিকরণের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি হিন্দু জনমত প্রবল থাকায় মুসলিম লিগ নেতৃত্ব অন্য চাল দেয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন যে, বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে বঙ্গকে ভাগ করা, সেই সময় থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন বাঙ্গালি হিন্দুদের বিষয়টি বুঝিয়ে জনমত তৈরি করার জন্য। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন এবং তিনি প্রচণ্ড বেগে সারা বঙ্গ চষে বেড়াতে লাগলেন এবং বড়ো বড়ো জনসভায় ভাষণ দিয়ে মানুষকে বঙ্গপ্রদেশ ভাগের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে লাগলেন। তিনি কংগ্রেসের কাছে আবেদন রাখলেন যে, তারাও যেন এই দাবিকে সমর্থন জানায়। ১৯৪৭-এর ১৫ মার্চ কলকাতায় হিন্দু মহাসভা একটি দু'দিন ব্যাপী আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে লর্ড সিনহা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ ঘটক, ঈশ্বরদাস জালান, হেমেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ হিন্দু মহাসভার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বহু মানুষও উপস্থিত হন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হলো যে বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন করতে হবে। এই সভায় একটি কমিটিও গঠিত হলো যাদের কাজ হবে একটা স্মারকলিপি প্রস্তুত করা যা সরকারের কাছে পেশ করা হবে।

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'-র ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় লেখা হয়— 'সম্প্রতি বঙ্গের কয়েকজন নেতা, পশ্চিমবঙ্গ নামে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে এই সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী— কারণ বঙ্গপ্রদেশের লিগ শাসনাধীনে বাঙ্গালি হিন্দুর ধন, প্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, নারীর মর্যাদা বিপর্যস্ত। সম্মেলন স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবি জানাইতেছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ, মেজর জেনারেল এসি চ্যাটার্জি, ড. প্রমথনাথ বাঁড়ুজ্জে প্রমুখ ব্যক্তি এই আন্দোলনের কার্যকরী সমিতির সদস্য, সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।'

বঙ্গপ্রদেশ ভাগ করা উচিত কিনা এই প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৯৪৭-এর ২৩ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত একটি জনমত সমীক্ষা করে। ফলাফল ঘোষিত হয় ২৩ এপ্রিল। এতে মোট ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৪৯টি উত্তর আসে। এর মধ্যে ১.১ শতাংশ উত্তর বাতিল হয়। বাকি উত্তরের মধ্যে ৯৮.৩ শতাংশ বঙ্গ ভাগের পক্ষে ও ০.৬ শতাংশ বিপক্ষে মত দেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ০.৬ শতাংশ বিপক্ষে মত দেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ০.৪ শতাংশ ছিল মুসলমান। অর্থাৎ এ সময়ে বাঙ্গালি হিন্দুরা প্রায় সকলেই বঙ্গ ভাগের পক্ষে ছিলেন তা বোঝা যায়।

১৯৪৭-এর ২৩ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একটি বৈঠকে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন কেন বঙ্গপ্রদেশ ভাগ করা দরকার। এই পরিকল্পনা বোঝানোর জন্য তিনি প্রচুর দলিল-দস্তাবেজ এবং মানচিত্র তৈরি করেছিলেন এবং এইগুলি বড়লাটের আপ্তসহায়ক

হিন্দু শরণার্থী প্রসঙ্গে বনগাঁ সীমান্তে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে কথা বলছেন শ্যামাপ্রসাদ। সঙ্গে দেবেন্দ্র নাথ মুখার্জি।

ইসমে-র কাছে দিয়ে আসেন। ১৯৪৭-এর মে মাসে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস একত্রে জনসভা ডাকে যার সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্যার যদুনাথ সরকার। ১৯৪৭-এর ২ মে শ্যামাপ্রসাদ মাউন্টব্যাটেনকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই তথ্যনির্ভর পত্রে তিনি বঙ্গপ্রদেশ ভাগের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেন। এই চিঠিতে বঙ্গভাগের দাবি করে শ্যামাপ্রসাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন যে, 'Sovereign undivided Bengal will be a virtual Pakistan.' কলকাতার ব্রিটিশ মালিকানাধীন দৈনিক 'The Statesman' ১৯৪৭-এর এপ্রিল 'Twilight of Bengal' শিরোনামে একটি সংবাদে লেখে, গত ১০ সপ্তাহের মধ্যে বঙ্গ ভাগ করার আন্দোলন একটি ছোটো মেঘপুঞ্জের আকার থেকে একটি বিশাল ঝড়ের আকার নিয়েছে এবং এই ঝড় পুরো প্রদেশ জুড়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যদিও এর কেন্দ্রভূমি হচ্ছে কলকাতা। এই ঝড় আরম্ভ করেছিল হিন্দু মহাসভা।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সময় চেষ্টা করছিলেন সোহরাওয়ার্দি-বসু-হাশিম ত্রয়ীর এই ভয়ংকর পরিকল্পনাকে বানচাল করতে। ১৯৪৭ সালের মে মাসের প্রথম দিকে গান্ধী ও নেহরুকে তিনি বঙ্গপ্রদেশ ভাগের পক্ষে বললে তাঁরা খুব একটা নির্দিষ্ট করে কিছু জানাননি। ১৯৪৭-এর ১৩ মে শ্যামাপ্রসাদ সোদপুরে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সোহরাওয়ার্দির যুক্তবঙ্গের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চান। গান্ধী বলেন, তিনি এখনও মনস্থির করে উঠতে পারেননি। শ্যামাপ্রসাদ যখন গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি বঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষকে কল্পনা করতে পারেন কী না? স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে গান্ধী এর কোনো উত্তর দেননি। কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেল খুব দৃঢ়ভাবে শ্যামাপ্রসাদকে চিঠিতে জানান যে, শ্যামাপ্রসাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর ভরসা রাখতে পারেন। বঙ্গের হিন্দুরা যতদিন নিজেদের স্বার্থ বুঝছে এবং সেই অবস্থান থেকে না সরছে ততদিন ভয়ের কোনো কারণ নেই। স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গের ডাক মুসলিম লিগের পাতা একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বঙ্গকে কখনই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

হিন্দু মহাসভা বঙ্গ ভাগের দাবি নিয়ে সোচ্চার হতেই কংগ্রেসিরা দেখল তাদের ভোটার যারা--- সেই হিন্দুরা (বঙ্গের মুসলমানরা প্রায় সকলেই মুসলিম লিগের সমর্থক ছিল) তাদের নপুংসকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দু মহাসভার পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। তখনই বঙ্গের কংগ্রেস দল নড়েচড়ে ওঠে। তারাও তখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মতামতের তোয়াক্কা না করে হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবানুসারেই বঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের জন্য দুটো আলাদা মন্ত্রীসভা গঠনের দাবি তোলে ১৯৪৭-এর ৪ এপ্রিল। বঙ্গের আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতৃত্ব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য মনীষীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙ্গালি হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় ব্রতী হয়।

পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্য পূরণের জন্য ৭৬টি বড়ো সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৫৯টির আয়োজন করে বঙ্গের কংগ্রেস কমিটি, ১২টির আয়োজন করেছিল হিন্দু মহাসভা এবং পাঁচটি যৌথভাবে আয়োজিত হয়। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৭-এর ২০ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের পশ্চিমবঙ্গের সদস্যরা বঙ্গের দ্বিখণ্ডীকরণ করে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড বা পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাব ৫৮-২১ ভোটে পাশ করান। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই কীর্তি (পশ্চিমবঙ্গ গঠনে) তাঁর জীবনীকার তথাগত রায়ের মতে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। নেহরু একবার শ্যামাপ্রসাদকে বলেছিলেন যে, 'আপনিও তো দেশভাগ সমর্থন করেছিলেন।' উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, 'আপনারা ভারত ভাগ করেছেন, আর আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি।' কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণীভূষণ চক্রবর্তী লিখেছেন যে, শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গের প্রস্তাব প্রতিরোধ করতে সমর্থ হলেন এবং দেশভাগের ভিতর আরেকটা দেশভাগ করিয়ে দিলেন।

(লেখক ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে গত ৩ জুন থেকে শুরু হয়ে ১৮ জুন সমাপ্ত হয়। মুখ্য ও বিশিষ্ট অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা সমাজসেবী নন্দগোপাল খৈতান

এবং মহাদলিত ফেডারেশনের অখিল ভারতীয় সহ সভাপতি কালিচরণ মল্লিক। উপস্থিত ছিলেন বর্গের সর্বাধিকারী তথা কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক রমেশ সরাওগী,ক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক জয়ন্ত পাল। শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকদের শারীরিক কসরৎ প্রদর্শনের পর বর্গ কার্যবাহ প্রতিবেদনে জানান, সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে দক্ষিণবঙ্গের ১৫৪ স্থান থেকে ১৭৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ছাত্র ৭৫ জন, শিক্ষক ১০ জন, উকিল ২ জন, ১ জন গবেষক, চাকুরিজীবী ১৮ জন, ব্যবসায়ী ৫৭ জন, কৃষক ও শ্রমিক ১১জন। শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকদের সামনে সময়োচিত বৌদ্ধিক রাখেন ক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল। অনুষ্ঠানে বহু নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

পুনেতে সক্ষম-এর রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

গত ৮ ও ৯ জুন সক্ষমের রাষ্ট্রীয় অধিবেশন সম্পন্ন হলো মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে। ৮ তারিখ সকালে সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে এবং অযোধ্যা শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ স্বামী গোবিন্দদেব গিরি মহারাজ। ভারতমাতা এবং অষ্টাবক্র মুনির প্রতিকৃতিতে তাঁরা পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। অধিবেশনে সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এক সময় বেশ কয়েকজন কৃতী দিব্যাঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা জানানো হয়। রাত্রিকালীন কার্যক্রমে দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনদের দ্বারা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের দিব্যাঙ্গ বোন শ্রীমতী শোভা মজুমদার নৃত্য পরিবেশন করেন।

সারা দেশ থেকে ৮৫০ জন কার্যকর্তা অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রান্ত সভাপতি তনয় দাস, প্রান্ত সম্পাদক চন্দন রায়, প্রান্ত সহসভাপতি ডাঃ দেবাশিস বিশ্বাস এবং মহিলা প্রমুখ লিপিকা দাস অংশগ্রহণ করেন। দুই দিনের অধিবেশনে ৯ জুন সংগঠনের নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি এস গোবিন্দ রাজের ধন্যবাদসূচক ভাষণের পর অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

With Best Compliments from -

ARDA

অধিক দুধ উৎপাদন ও গবাদি পশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য সমস্ত দুধ উৎপাদকগণের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

- আলো বাতাসযুক্ত পরিষ্কার পরিবেশ শুকনো সমতল গোয়ালের ব্যবস্থা করুন।
- গবাদি পশুকে সুষম খাদ্য খাওয়াবেন, যার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ইত্যাদি উপযুক্ত মাত্রায় রয়েছে।
- একবার খাওয়ালে হজম করতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে, তাই দিনে দু'বারই খাবার দেবেন।
- গবাদি পশুকে খাওয়াবার এক থেকে দুই ঘণ্টা পর জল খাওয়াবেন।
- গবাদি পশুকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস খাওয়াবেন।
- মশা, মাছি, এটুলি থেকে গোয়ালঘরকে মুক্ত রাখতে পারলে গবাদি পশুকে অনেক ভয়ঙ্কর রোগ থেকে রক্ষা করা যাবে।
- অম্বল বা বদহজম থেকে আপনার গবাদি পশুকে রক্ষা করতে ভাত সেদ্ধ খাবার বা ভিজিয়ে খাবারের অভ্যাস ত্যাগ করুন।

রিষড়া প্রেম মন্দিরে বাঙ্গালির আত্মজাগরণ সভা

গত ১৫ জুন হুগলী জেলার রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমে স্বদেশী বার্তা সাহিত্য পত্রিকা এবং প্রেম প্রবাহ ত্রৈমাসিক পত্রিকার উদ্যোগে 'বাঙ্গালির আত্মজাগরণ সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সহযোগিতায় ছিল 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির'। সভায় উপস্থিত ছিলেন রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, মহানাম সম্প্রদায়ের সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ, স্বদেশী বার্তা পত্রিকার প্রকাশক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, স্বদেশী বার্তা পত্রিকার সম্পাদক সৈকত চট্টোপাধ্যায়। প্রেম প্রবাহ পত্রিকার সম্পাদক ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী অধ্যাপক (ড.) কল্যাণ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ড. রাকেশ দাশ, প্রাবন্ধিক অরিত্র ঘোষ দস্তিদার, দেশের ডাক পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক সঞ্জয় পাল, স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়, সমাজসেবী ভরত কুণ্ডু, দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সদস্য মিলন খামারিয়া প্রমুখ।

বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সভার শুভারম্ভ হয়। ঈশোপনিষদ পাঠ করেন আশ্রমিক সুপ্রতিম চক্রবর্তী। অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয় তিলক, উত্তরীয় পরিয়ে এবং তাঁদের হাতে চারাগাছ দিয়ে। নির্গুণানন্দজী মহারাজের হাতে নিজের হাতে তৈরি রাধা-কৃষ্ণের বাঁধানো ছবি তুলে দেন অয়ন নাগা। স্বাগত ভাষণ দেন সৈকত চট্টোপাধ্যায়।

নির্গুণানন্দজী মহারাজ বলেন, রাজগুরুর ভূমিকায় সাধুসন্তরা আজীবন তাঁদের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কিন্তু ইদানীং কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সাধু-সন্ন্যাসীদের বিভিন্নভাবে কটূক্তি করছেন। এতে তারা ভারতীয় পরম্পরাকেই অসম্মান করছেন।

বন্ধুগৌরব মহারাজ বলেন, শাসকরা বর্তমানে যথার্থ সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি হলুদ সাংবাদিকতাও চলছে। এর বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের পত্রিকায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি বিজ্ঞানের আলোচনাও হয়ে থাকে। ভারতীয় ঋষিরা গণিত ও বিজ্ঞানে খুবই দক্ষ ছিলেন।

অধ্যাপক কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, বাঙ্গালির অতীত গৌরব এবং তার চরিত্রের অবনমনের চিত্র যা রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় প্রমুখ মনীষীর কবিতায় ফুটে উঠেছে। তিনি সমকাল কথাটির ব্যাখ্যা করেন এবং এই রাজ্যে এই সময়ে সংঘটিত নানান অনভিপ্রেত পরিস্থিতির উদাহরণ দেন। আগামীদিনে ছোটো ও মাঝারি পত্রপত্রিকা কীভাবে সত্যপ্রকাশ করতে পারে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় অবদান রাখতে পারে, তা ব্যাখ্যা করেন।

প্রকাশক তথা সমাজসেবী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, বাঙ্গালির আত্মজাগরণ ঘটাতে গেলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাকে যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে, যেমনভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে হয়েছিল।

সভার শেষ পর্বে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। বর্তমানে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে,সাংবাদিকরা শাসকের অঙ্গুলিহেলনে ঠিকমতো কাজ করতে পারছেন না, সে বিষয়ও বিভিন্ন জনের প্রশ্নে উঠে আসে। পাশাপাশি বিভিন্ন ছোটো পত্রপত্রিকা ও পোর্টালগুলো শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও বাঙ্গালির বীরত্বের ইতিহাস এবং বর্তমান সময়ে বিশ্বমঞ্চে বাঙ্গালির সম্মানিত হওয়াকে যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে।

সভার সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন গৌতম বর্মন, সুমন রায়, ধ্রুবজ্যোতি পাল। সঞ্চালনায় ছিলেন মিলন খামারিয়া।

With best Compliments from :

CASTRON TECHNOLOGIES LIMITED

Manufacturer of :

FERRO MANGANESE

SILICO MANGANESE

LOW PHOS FERRO MANGANESE

Regd. office :

14, Bentinck Street, 1st floor, Room No. 8

Kolkata - 700 001, West Bengal (India)

Phone : (91-33) 22624465

Head Office :

Yogamaya, Dhaiya, Post - Nag Nagar

DHANBAD - 826 004, Jharkhand (India)

Phones : (91-326) 2207886, 2203390

Fax : (91-326) 2207455, E-mail : atul@castrontech.com

Works :

Phase- III/B-4, B-5, Bokaro Industrial Area

Balidih, Bokaro Steel City - 827 014

Jharkhand (India)

Phones : (91-6542) 253511, Fax : (91-6542) 253701

হিন্দু মিলন মন্দিরের উদ্যোগে হিন্দু ধর্মসম্মেলন

উত্তর মালদার চাঁচল সংলগ্ন ভগবতীপুর গ্রামের হিন্দু মিলন মন্দিরের দুদিন ব্যাপী ২৮তম হিন্দু ধর্মসম্মেলনের গত ১৬ জুন সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী। বক্তারা তাঁদের ভাষণে হিন্দুধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি এবং বর্তমানে হিন্দু সমাজের উপর আগত বিভিন্ন সমস্যা, আঘাত, বিপত্তি ও তার প্রতিকারের উপায় তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে এলাকার কয়েকজন মা'কে তাঁদের অসাধরণ কাজের জন্য সম্মানিত করা হয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সম্পাদিত প্রণব পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ স্বামী যুক্তানন্দ মহারাজ লিখিত 'শ্রীশ্রীরামনাম মহিমা' পুস্তক উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অদ্বৈতচরণ দত্ত মহাশয় তাঁর ভাষণে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের স্বপ্নের হিন্দু মিলন মন্দির গ্রামে গ্রামে স্থাপনা ও সচল রাখার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন হিন্দু সমাজের সাহসী মানসিকতা ও অফুরন্ত শক্তি রয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের ভয়মুক্ত করার জন্য গ্রামে গ্রামে যুবকদের সংগঠিত করতে হবে। মাতৃশক্তিরও জাগরণ ঘটাতে হবে।

এদিন মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে বৈদিক শান্তিযজ্ঞ এবং নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ বেশ কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষা দান করেন। হাজার হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে এদিনের অনুষ্ঠান এক আনন্দময় পরিবেশে রচনা করে।

ত্রিপুরা ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের কার্যালয় উদ্বোধন

গত ১৬ জুন ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ত্রিপুরা ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের নিজস্ব কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন সন্ধ্যা ৭টায় আগরতলাস্থিত অসম-আগরতলা রোডে ইলেকট্রিক রিকশাচালকদের একটি

সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি সবুজ সরকার। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি সুশ্রী দেবশ্রী কলই। তিনি নবনির্মিত কার্যালয়টিকে মন্দিরের দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান। সভার প্রধান বক্তা সর্বভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক রবিশঙ্কর আলুরি তাঁর ভাষণে ইলেকট্রিক রিকশাচালকদের পরিচয়পত্রের বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মহাসঙ্ঘের সভাপতি অসীম দত্ত, ত্রিপুরা রাজ্য মজদুর সঙ্ঘের সম্পাদক অজিত গোস্বামী, পশ্চিম জেলা ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সম্পাদক বাবুল ঘোষ, ত্রিপুরা রাজ্য ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের সংগঠন সম্পাদক রাজু কুমার বণিক, ত্রিপুরা রাজ্য রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক খোকন ঘোষ, ত্রিপুরা রাজ্য ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের রাজ্য সম্পাদক সুমন শীল, ত্রিপুরা রাজ্য ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের পশ্চিম জেলা সম্পাদক লিটন পাল।

সমাপ্তি ভাষণ দেন ত্রিপুরা ইলেকট্রিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি সবুজ সরকার। সভা সঞ্চালনা করেন খোকন ঘোষ।

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

বনগাঁয় বসে বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনছেন শ্যামাপ্রসাদ (১৯৫২ সাল)।

ত্রাণ ও সেবাকর্মে শ্যামাপ্রসাদ

কল্যাণ গৌতম

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের পুরনো আশ্রম বাড়ি এবং প্রাচীন সাধুনিবাসের মধ্যবর্তী একটি বহু পুরাতন আমগাছের তলা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্মৃতিধন্য হয়ে আছে। ১৯৪৫ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি খড়দায় এসেছিলেন এই আশ্রমে অনাথ ছাত্রদের দেখতে। আবাসিক ছাত্ররা সেদিন সংগীত পরিবেশন করে মুগ্ধ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদকে। ছাত্রদলের মধ্যে ছিলেন সেনহাটি হাইস্কুলের ছাত্র কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী বা কেষ্ট, যিনি পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছিলেন স্বামী নিত্যানন্দ বা কেষ্ট মহারাজ, রহড়া বালকাশ্রমের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ এবং বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৪৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৩৭ জন বালক-নারায়ণকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম। তার একমাস আগে ১৬ আগস্ট ঠাকুর-মা-স্বামীজীর পূজা ও হোমের মাধ্যমে আশ্রমের কাজ শুরু হয়ে যায়। রহড়া বালকাশ্রমের প্রথম কর্মসচিব স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ। তাঁর সঙ্গে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সুসম্পর্ক ছিল। ১৯৪৫ সালে স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজের আমন্ত্রণেই শ্যামাপ্রসাদ রহড়ায় এসেছিলেন।

সেবাকার্যের সুবাদে এই দুই কর্মযোগী আগেই সান্নিধ্যে আসেন। শ্যামাপ্রসাদ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের কাছে সবসময় ছুটে গেছেন, সর্বস্বান্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। রাজনীতিতেও তাই। মানুষের সেবাই ছিল রাজনৈতিক আদর্শ, যার অবস্থান পেশাদারি রাজনীতির অনেক ঊর্ধ্বে। মন্ত্রী থাকার সময়ে তিনি দুর্গত মানুষের কাছে গেছেন, বাধাপ্রাপ্ত হলে বিনা দ্বিধায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছেন।

হিন্দু মহাসভার কর্ণধার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উদ্যোগে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। বাংলাদেশের খুলনার সেনহাটি হাইস্কুল ছিল এই রকম প্রতিষ্ঠান। নানান কারণে শ্যামাপ্রসাদ এই স্কুলটি চালাতে পারছিলেন না। তিনি পুণ্যানন্দজীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং এই সমস্ত ছেলেকে পাঠাতে চাইলেন রামকৃষ্ণ মিশনে। স্বামীজী রাজি হলেন। পরবর্তীকালে ওই ছাত্রদের জন্য

একটি বাড়ি নির্মাণের ব্যাপারে তিনি হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে একটি বড়ো অঙ্কের টাকা দান করলেন। এই টাকায় খড়দায় তৈরি হয়েছিল 'হিন্দু মহাসভা ধাম'। এটি রহড়া বালকাশ্রমে প্রথম সারির দ্বিতীয় হোস্টেল। এখনও তার ফলক দেখতে পাওয়া যাবে।

রহড়া আশ্রমে শ্যামাপ্রসাদ উপস্থিত হলে স্বামীজী নিজে তাঁকে সাদরে বরণ করেন। ফুল-মালা দিয়ে স্বামীজী নিজে তাঁকে সম্মান জানান। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর পরামর্শে শ্যামাপ্রসাদ 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' নামে নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করলেও রহড়ার সঙ্গে অমোচ্য সম্পর্ক ছিল, কারণ পুণ্যানন্দজী ও শ্যামাপ্রসাদ উভয়েই ছিলেন মনেপ্রাণে শিক্ষাবিদ, আর শ্যামাপ্রসাদের প্রিয় স্কুলের ছেলেরাও যে সেসময় পড়ছেন রহড়ায়। নিজে আর পরে আসতে পারেননি, সমকালীন নানান ঘটনাবর্তে শ্যামাপ্রসাদ চূড়ান্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন— ১৯৪৫ সালে নেতাজীর অন্তর্ধান, ১৯৪৬-এর হিন্দুহত্যা, ১৯৪৭-এ ভারত বিভাজন, স্বাধীনতা লাভ এবং জাতীয় সরকারে যোগদান, ১৯৪৮ সালে গান্ধীজী হত্যা, ১৯৪৯-এ হিন্দু মহাসভা থেকে পদত্যাগ, ১৯৫০-এ নেহরু-লিয়াকত চুক্তি, ১৯৫৩-তে কাশ্মীর নিয়ে আন্দোলন ও বন্দি অবস্থায় তাঁর মৃত্যু। আর আসা হয়নি শ্যামাপ্রসাদের। কিন্তু তদানীন্তন আশ্রমিকের অনেকের কাছেই শোনা, রহড়ার সঙ্গে সবসময় তিনি যোগাযোগ রেখেছিলেন। এমনকী তাঁর আত্মবলিদানে সেদিন বাকরুদ্ধ হয়েছিল আশ্রম চত্বর।

'শ্যামাপ্রসাদ' নিয়ে গবেষণা করাটা এক সময় 'সাম্প্রদায়িক পদবাচ্য' হতো। তাই বুদ্ধিজীবীরা ভয়ে-ভক্তিতে সে পথে আর কেউ যাননি। কিন্তু আঞ্চলিক ইতিহাস উপাদানের পুঁথি গেঁথে গেঁথেই সামগ্রিক ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয়— 'তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো কভু।' অনাথ ছাত্রদের জন্য শ্যামাপ্রসাদের বেদনার্ত হৃদয়, তাঁর সহৃদয়তার কথা হারিয়ে যায়নি, খড়দার বুকেও কিছুটা জেগে আছে।

শ্যামাপ্রসাদের অবদানের কথা অস্বীকার করতে পারেননি শতবর্ষোত্তীর্ণ খড়দহের এক কমিউনিস্ট নেতা প্রয়াত গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি খড়দহের প্রাক্তন পুরপ্রধান (১৯৬১ সালের ১ মে থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর) এবং বিধায়ক (১৯৬২-৬৭) ছিলেন। ছিলেন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক এবং দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রাক্তন সদস্য। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উদ্যোগেই তাঁর সমাজসেবামূলক কাজে হাতেখড়ি হয়েছিল এমনটাই উল্লেখ আছে তাঁর আত্মজীবনীতে। তখন তিনি বাগবাজার মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনে ক্লাস এইটে পড়ছেন। সারা বঙ্গে, এমনকী কলকাতাতেও গরিব মানুষ ও বস্তিবাসীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার তখন নগণ্য। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সেইসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর উদ্যোগেই নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে ওইসব মানুষকে সাক্ষর করার অভিযান সংগঠিত হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য স্কুলের উঁচু ক্লাসের এবং কলেজের ছাত্রদের নিযুক্ত করা হলো। গোপালবাবুর স্কুলে উঁচু ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র এই অভিযানে স্বেচ্ছায় যোগ দিলেন; যোগ দিলেন গোপালবাবু নিজেও। তিনি কাশীপুর এলাকায় একটি ধাঙ্গড় বস্তিতে নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কাজ করলেন। যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তারাও গভীর আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়াশোনায় অংশগ্রহণ করত। এই অভিযানে অংশ নিয়েই তিনি গরিব মানুষের দুরূহ জীবনসংগ্রাম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছেন। তাদের প্রতি মমতা ও দায়িত্ব বেড়েছে। তাদের সংগ্রামের প্রতি সহমর্মিতা অঙ্কুরিত হয়েছে। ধাঙ্গড়, মেথরদের সঙ্গে মিশে নিজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারও দূর হয়েছে।

পরে ১৯৪৩ সালে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-এর সময় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উদ্যোগে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠিত হলে গোপালবাবু সেখানেও সংগঠনের ত্রাণকার্যে জড়িয়ে পড়লেন। তখন গোপালবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রিতে এমএসসি করছেন। কমিটি কিছু অর্থ, ত্রাণসামগ্রী ও ওষুধ নিয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের ত্রাণকার্য পরিচালনা করছিল। কিন্তু নানান এলাকায় গিয়ে তা বণ্টনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক তরুণ স্বেচ্ছাসেবক ছিল না। এই সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। কমিটির পক্ষ থেকে কিছু ছাত্র বেঙ্গল রিলিফ কমিটির ত্রাণ বণ্টনের কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যান। অ্যাপ্লায়েড বিভাগ থেকে অংশ নেন গোপালবাবু নিজে। এই পর্বে কলেরা প্রতিষেধক ইনজকেশন দেবার জন্য সহপাঠী সরোজ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের গ্রামে গিয়ে কাজ করেছিলেন। ফিরে এসে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। সুস্থ হয়ে তিনি মার্টিন কোম্পানির ছোটো ট্রেনে চেপে চাঁপাডাঙা হয়ে গিয়েছিলেন আরামবাগ। সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সংগঠন-প্রেরিত চাল, ডাল, কাপড় প্রভৃতি ত্রাণসামগ্রী তদারকি করে গ্রামবাসীদের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই ত্রাণকার্যের মাধ্যমে তাঁর গ্রাম সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং পরবর্তী কাজ করার প্রেরণা পান। তিনি লিখছেন, 'মোট কথা, ত্রাণের কাজের মধ্য দিয়ে বঙ্গ ও তার সমাজ জীবন সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনা কিছুটা প্রসারিত হয়েছিল। পরে বুঝেছি এই উপকারটা মোটেই অকিঞ্চিৎকর ছিল না।'

খড়দায় শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে একটি মিথ্যা কুৎসার পরিমণ্ডল ছিল, বিগত এক দশকে অবশ্য তার অনেকটা চলে গেছে, তবে এখনও কিছুটা রয়ে গেছে। খড়দার মানুষের সঙ্গে মিশে দেখেছি, তারা সত্যি ইতিহাসটা জানতে চান, ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে চান। পশ্চিমবঙ্গ তৈরির ইতিহাস কী ইত্যাদি। আগামীদিনে এই চর্চা স্থায়ী রূপ পাবে বলেই খড়দহবাসীর ধারণা।

তপন শিকদার ছিলেন 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্মারক সমিতি'-র সাধারণ সম্পাদক এবং বাজপেয়ীজীর প্রধানমন্ত্রিত্বে ভারত সরকারের রসায়ন ও সার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। এই সময় তিনি সমিতির পক্ষ থেকে নিবেদন করলেন একটি সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থনা 'শতবর্ষের আলোয় শ্যামাপ্রসাদ'। বইটির প্রকাশকাল ২০০২ সালের জুলাই। ওই গ্রন্থে তপনবাবু নিজেও একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'জনসেবায় শ্যামাপ্রসাদ'।

তপনবাবুর প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আর্তত্রাণে শ্যামাপ্রসাদ; তাঁর সেবাব্রতী

রাজনৈতিক সত্তাকে নানানভাবে তুলে ধরেছেন। যখনই প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছে, মানুষ রাজনীতির শিকার হয়েছে, সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হয়েছে— তখনই ছুটে গেছেন শ্যামাপ্রসাদ। এককথায়, বিপন্ন মানুষের সেবা যে তাঁর অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, তা ফুটে উঠেছে বারবার তপনবাবুর লেখায়। আদর্শের প্রশ্নে তিনি দু'বার মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছিলেন। জীবিকান্বেষণের প্রয়োজনে তিনি শিক্ষাক্ষেত্র ছেড়ে রাজনীতিতে আসেননি। সেবাই প্রথম ও শেষ লক্ষ্য ছিল।

তপন শিকদার লিখছেন, 'শ্যামাপ্রসাদের সেবাধর্মী রাজনীতির প্রথম প্রসাদ জুটল দুর্ভাগ্য নোয়াখালির ভাগ্যে। শ্যামাপ্রসাদ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য। তিনি দেখতে পেলেন মুসলিম লিগের দুঃশাসনে বঙ্গের হিন্দুদের মানসম্মান, বিষয়সম্পত্তি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি সবই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর সরকারি মদতে যে হাঙ্গামা ও নারী নির্যাতন শুরু হয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কেউ নেই।' তপনবাবু লিখছেন, হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চাপাবার কালেই নোয়াখালি জেলার উপর দিয়ে ১৭ ঘণ্টাব্যাপী বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল, চাষবাস ব্যবসা-বাণিজ্য তছনছ হলো। হিন্দু মহাসভা যথাসাধ্য ত্রাণের ব্যবস্থা করেছিল সে সময়; নোয়াখালির দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের বিষয়ে তিনি জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কলকাতায় বৈঠকে মিলিত হন। ঝড়ে নারকেল ও সুপারি চাষে প্রভূত ক্ষতি হয়; তাই জেলার তাঁত শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে পুনর্বাসনের বিষয়ে আলোচনা হয়; পরবর্তী ফসল ওঠার আগে পর্যন্ত ত্রাণকার্য পূর্ণোদ্যমে চালানোর পরামর্শ দেন তিনি।

১৯৪১ সালে ঢাকার দাঙ্গাবিধ্বস্ত হিন্দুদের পাশে থাকেন শ্যামাপ্রসাদ। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট দল, ফরোয়ার্ড ব্লক এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকে; তখন এগিয়ে এলেন শ্যামাপ্রসাদ। সবেমাত্র হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেছেন তিনি। যাতে হিন্দুদের পাশে না থাকতে পারেন, তার যাবতীয় চেষ্টা করলেন গভর্নর হাবার্ট। শ্যামাপ্রসাদও দমবার পাত্র নন; জীবন বিপন্ন করে দুই আসনের প্রাইভেট প্লেনে ঢাকা পৌঁছালেন তিনি। প্লেন চালাচ্ছিলেন জনৈক লোহিয়া নামে তাঁর মাড়োয়ারী বন্ধু। শ্যামাপ্রসাদ লিখছেন, 'Before I got down I could see the whole of city in flames. Blair, Commissioner, at first would not allow me to enter Dacca as I was like a red rag to the bull and the Muslims would become uncontrollable if I remained there.' শ্যামাপ্রসাদ বাধা মানলেন না, প্রবল জোরাজুরি করলেন, অবশেষে কমিশনার ঢাকা শহরে ঢুকতে দিলেন। সেখানে কয়েকদিন থেকে হিন্দুদের সংগঠিত করে, ত্রাণের ব্যবস্থা করে, ত্রাণ নিয়ে বৈষম্য যাতে না হয় তার জন্য সরকারি কর্মচারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তবে ঢাকা ছাড়লেন তিনি। পরে কলকাতা থেকে আবারও ত্রাণ সামগ্রী পাঠালেন ঢাকায়; নিজে আবার ঢাকায় গেলেন; ঢাকার হিন্দুদের আশ্রয় ও সাহায্যের জন্য আগরতলায় গিয়ে মহারাজকে ধন্যবাদ জানালেন।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে নোয়াখালিতে সেবাকাজ চালিয়েছিলেন তিনি। নোয়াখালি জেলা শিক্ষক সমিতি শ্যামাপ্রসাদের মাধ্যমে দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষকদের জন্য আর্থিক সহায়তা পেয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু মহাসভা দেশব্যাপী প্রচার চালিয়ে বঙ্গের জন্য নগদ অর্থ, বস্ত্র ও খাদ্যশস্য সংগ্রহ করল। ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য তিনি নিজে Bengal Hindu Mahasabha Relief Committee-র সভাপতিত্ব করলেন। বহু মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্য প্রদান করা হলো; এছাড়াও চিপ ক্যান্টিনের মাধ্যমে সুলভে খাদ্যসামগ্রী বিক্রি হলো, মিল্ক ক্যান্টিনের মাধ্যমে গরিবদের দুধ বিতরণ করা হলো। অনাথ আশ্রম তৈরি করে দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের রাখা হলো।

শ্যামাপ্রসাদের মেদিনীপুরের সেবাকাজ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন তপনবাবু। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে মেদিনীপুর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মেদিনীপুরবাসীর নানান দুর্ভোগে তাঁর সহানুভূতি ও অশ্রু বিসর্জন ছিল। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়েই ১৬ অক্টোবর মেদিনীপুরের বুকে আছড়ে পড়েছিল প্রবল ঘূর্ণিঝড়। বঙ্গের বুকে নেমে এলো প্রবল অন্ধকার। প্রতিশোধপরায়ণ ব্রিটিশ সরকার বিপর্যয়-বিধ্বস্ত মেদিনীপুরবাসীর জন্য কোনো ত্রাণের ব্যবস্থা করল না। দুর্যোগের সংবাদ ১৫ দিন চেপে রাখা হলো, কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেওয়া হলো না। বিপর্যয়ে দশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, বারোআনা গবাদিপশু মারা গেল, এক লক্ষ বাড়ি ধ্বংস হলো। সিভিলিয়ানরা দুর্গতদের জন্য এগিয়ে এলেন না। এগিয়ে এলেন শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার দরদি শ্যামাপ্রসাদ বিশেষ করে কাঁথির মানুষের বন্ধু হয়ে। তপন শিকদার লিখছেন, 'শান্ত বঙ্গোপসাগর রুদ্রের তালে বুকে নাচন জাগিয়ে শান্তির নীড়কে করেছিল বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। তীরের অনেক গ্রাম মুছে গেল। অনেক প্রাণ ঝরে গেল পৃথিবী থেকে। বিপন্ন মানবতা সেদিন একটি মানুষকে দেখেছিল তাদের পাশে। তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ।'

শ্যামাপ্রসাদ সেদিন সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 'Bengal Cyclone Relief Committee' গড়ে তুললেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে কোষাধ্যক্ষ করে নিজে তার সভাপতি হলেন এবং অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষকে সম্পাদক করলেন। তার আগে তিনি মেদিনীপুরের বিদ্রোহী পরিবারবর্গকে সাহায্যের জন্য তৈরি করেছিলেন 'Sufferers' Relief Committee.' দুর্গতদের সাহায্য পৌঁছে তিনি ব্রিটিশদের অবহেলার চিত্র বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন।

মেদিনীপুরের মানুষের জন্য কী অসামান্য পরিশ্রম করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, তার অনুপুঙ্খ আলোচনা আছে এই প্রবন্ধের পরতে পরতে। জনদরদি শ্যামাপ্রসাদের ভাবমূর্তির এক অনবদ্য রূপ দেখেছিল মেদিনীপুরবাসী, যখন অন্য কোনো নেতাকে ধারে-কাছে পাওয়া যায়নি। সশরীরে উপস্থিত থেকে, সমবেদনা-সহানুভূতি জানিয়ে, যথাসাধ্য ত্রাণ ও সাহায্যের বিষয়ে তাঁর মতো রাজনীতিবিদ আজও বিরল। পুরো প্রবন্ধে তপনবাবু দেখিয়েছেন, শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবন আসলে মানবতার অন্য নাম। তিনি লিখলেন, 'আর শেষও ঘটল তেমনিভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের বিপন্ন হিন্দুদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে এবং দেশের অখণ্ডতা রক্ষার্থে অমূল্য প্রাণবিসর্জনের মাধ্যমে।' □

THE CO-WORKING EXPERIENCE

BECOME A MEMBER OF CORNER DESK

Co-working offers more freedom, independence, possibilities for self-realisation.

At the Heart of Kolkata in Chandani Chowk

Address : 4th Floor, 10 Raja Cubodh Mullick Square

Don't be afraid to give up the good to go for the great.

FOR DETAILS CONTACT : 9836054628 I 8334051100

সত্যে অবিচল ছিলেন যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ভারতবাসী একজন জনদরদি কলঙ্কহীন খাঁটি নেতার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের পরম সৌভাগ্য তিনি এই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতকে ধন্য করেছেন— তিনিই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে—

'নূতন তব জন্মলাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আনো অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ,
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণী কর কলঙ্কশূন্য।'

১৯৩৭ সালের কথা। অবিভক্ত বঙ্গের প্রাদেশিক আইন সভায় ভাষণ দেবেন বাগ্মীপ্রবর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান বিষয়ে। সে কারণে সেদিনের সভার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল সমধিক। সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের সকল বিধায়কই উপস্থিত হয়েছেন যথারীতি। অধিকন্তু, যেসব আইন সভার সদস্য মাঝে মধ্যেই অনুপস্থিত থাকতে অভ্যস্ত তাঁরও আজ এসেছেন সাগ্রহে। খালি নেই একটি আসনও, পূর্ণ হয়েছে সমস্ত আসন। সকলেই অপেক্ষা করছেন শ্যামাপ্রসাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে। তিনি সভায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল— শ্যামাপ্রসাদ এসে গিয়েছেন। বক্তৃতা আরম্ভ হলো। প্রত্যেকেই ভাষণ শুনছেন একান্ত মনোযোগ দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে। সমস্ত আইনসভা নীরব নিস্তব্ধ। একটি সূচ পড়লে শব্দ শোনা যাবে। তদানীন্তন অবিভক্ত বঙ্গের প্রিমিয়ার তথা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক।

১৯৩৫ ভারত আইন। ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫ মোতাবেক ১৯৩৭ সালে ভারতের ১১টি ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক আইনসভা ও মন্ত্রীসভাগঠিত হয়। সেই মন্ত্রী পরিষদের প্রধানকে বলা হতো প্রিমিয়ার বা প্রধানমন্ত্রী। সেই সুবাদে অখণ্ড বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন কৃষক প্রজাপার্টির প্রধান আবুল কাশেম ফজলুল হক। তিনি হাতে হাত রেখে আবিষ্ট হয়ে শ্যামাপ্রসাদের যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যসমৃদ্ধ, চিত্তাকর্ষক ভাষণ শুনতে শুনতে সঙ্গতভাবে বলে উঠলেন— 'বাঘের বাচ্চা বাঘ'। বক্তার সম্পর্কে সকলের সামনে আইনসভার ভেতরে অমায়িক গুণগ্রাহী হক সাহেবের উচ্ছ্বসিত মন্তব্য ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবাহী। ওই শব্দবন্ধ ছিল শ্যামাপ্রসাদের বৈচিত্র্যময় জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দ্যোতক। এক সময়ে ফজলুল হক আইনের স্নাতক হবার পর কলিকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদের পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহকারী হিসেবে। সেই সময় থেকেই চিনতেন আদর্শবাদী, ন্যায়পরায়ণ, নীতিনিষ্ঠ ও কর্তব্যে অবিচল শ্যামাপ্রসাদকে। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তাঁর জীবনের স্পন্দন ছিল স্বার্থশূন্য নিষ্কলুষ জনসেবায়। দেশসেবার স্বতন্ত্র স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন আত্মত্যাগের অমর মহিমায় উদ্ভাসিত ঔজ্জ্বল্যে। মানুষের মঙ্গল, স্বদেশের কল্যাণে এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের হিতসাধনই ছিল তাঁর মহান জীবনের মূল উদ্দেশ্য। নিরপেক্ষ জনসেবাই ছিল তাঁর জীবনব্রত।

অকুতোভয় শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন বঙ্গের মহীরুহ স্বরূপ। অসহায় হিন্দুর আশা-ভরসার স্থল এবং বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়া স্বরূপ। দেশ ও দশের সামগ্রিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের চিন্তায় সদাসর্বদা নিত্য নিরন্তর আত্মসমাহিত থাকতেন। অকাতরে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন মানবসেবার বেদিমূলে। স্বদেশের প্রতি তাঁর অমলিন ভালোবাসা ছিল স্বভাবসিদ্ধ, স্বতোৎসারিত। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সংবেদনশীল অনুভূতি ছিল আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণীয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল দুর্বার ও আপোশহীন। জনদরদি জননেতা সারা জীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন মানুষের স্বার্থে আত্মপ্রচারের অন্তরালে। প্রচারের পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে কোনোদিনই আগ্রহী ছিলেন না তিনি। কর্তব্যে পরিপুষ্ট, চারিত্রিক দৃঢ়তা, হৃদয়বত্ত, মানবিকতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। দলীয় সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণার বহু ঊর্ধ্বে বিচরণ করতেন। তাঁর মধ্যে ছিল উদার মানসিকতা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি ছিলেন বঙ্গের তথা ভারতের গর্ব ও গৌরব। তাঁর বিশাল মনের উচ্চতা ছিল বিরাট পাহাড়ের চূড়ার মতো। হৃদয়ের বিশালতা ছিল মহাসাগরের মতো অতলস্পর্শী, আর অন্তরের বিস্তার ছিল সীমাহীন আকাশের মতো।

এই কারণে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা পঙ্গু করতে পারেনি তাঁর ভাব ও ভাবনাকে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রভাবিত করতে পারেনি তাঁর বোধ ও বুদ্ধিকে। ধর্মান্ধতার অফিহেন আবিষ্ট করতে সমর্থ হয়নি তাঁর চিন্তা ও চিন্তনকে। জননেতার মন ও মননের উত্তরণ ঘটে ছিল অতি মানস চেতনায়, নিঃস্বার্থ মানবসেবায়। তিনি ছিলেন মনুষ্যত্ব ও মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ গৌরবদীপ্ত অকুতোভয় মহান পুরুষ। তিনি স্বার্থহীন অকপট দেশপ্রেমের আলোকে আপ্লুত করেছিলেন আপামর দেশবাসীকে এবং দেশবাসীও এই মানবতার পূজারিকে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়েছিল পরম শ্রদ্ধায়। যতদিন এগিয়ে যাচ্ছে ততই মানুষের উৎসাহ ঔৎসুক্য বেড়ে যাচ্ছে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে। তাঁকে জানতে, বুঝতে প্রবল কৌতূহল ও আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে দেশের মধ্যে। শ্যামাপ্রসাদের নিখাদ নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক জনহিতকর কাজের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়। এই মর্যাদাপূর্ণ আসন অলংকৃত করে বহু সংস্কার সাধন করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। তন্মধ্যে ইসলামিক ইতিহাস এবং সংস্কৃতের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন স্নাতকোত্তর স্তরে নিজে উদ্যোগী হয়ে। শুধু পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করেই বিরত হননি। তাঁর সার্বিক বিকাশ সাধনের জন্য বঙ্গের বাইরে থেকে বিদগ্ধ শিক্ষকমণ্ডলী ও অভিজ্ঞ গবেষকদের নিয়ে এসেছিলেন ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে। তিনি কোনোদিনই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেননি তাঁর মন ও মানসে। অতি উদার অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। প্রতিটি কাজেই অবিচল অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ ছিলেন প্রবাদপ্রতিম শ্যামাপ্রসাদ। অসংখ্য মুসলমান ছাত্রকে নানাভাবে সাহায্য করতেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাঁর দ্বারা উপকৃত সেইসব ছাত্রের মধ্যে অনেকের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ :

'Shyama Prosad was, despite his politics, a great and sincere friend of young men in difficulty than any other Hindus or Muslims they know.' Calcutta Review, 1944.

এক সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন স্যার হাসান সুরাবর্দি। সুষ্ঠুভাবে ওই প্রতিষ্ঠান চালাতে তাঁকেও সাহায্য করতেন উদার শ্যামাপ্রসাদ দ্বিধাহীন চিত্তে। পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে মুসলিম লিগের তরফে অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন স্যার হাসান সুরাবর্দির ভাগ্নে হোসেন সৈয়দ সুরাবর্দি। সরকারি পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় কুখ্যাত গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস নামক হিন্দু-সংহারের অগ্রনায়ক ছিলেন তৎকালীন যুক্তবঙ্গের এই প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম ভয়ানক অসুস্থ, সঙ্গে রয়েছে আর্থিক অনটনও। সেই ঘোর দুর্দিনে চোখের দেখাও কেউ দেখে না। খোঁজও নেয় না কোনো আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মূলত এড়িয়ে চলে সকলেই। এই প্রসঙ্গে ভগবান শঙ্করাচার্যের একটি পুণ্যশ্লোক উল্লেখ করা যেতে পারে—

'যাবদ্ বিত্তোপার্জ্জন শক্তঃ তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
পশ্চদ্ধাবতি জর্জরদেহে বার্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে।।

যতদিন মানুষের অর্থ-সম্পদ-বিত্ত-বৈভব থাকে ততদিনই আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অনুগত থাকে এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখে। টাকাপয়সার অভাব হলে, শরীর অক্ষম ও অপটু হলে, তখন আর কেউ ফিরেও তাকায় না। অবহেলা, অগ্রাহ্য করে। এটাই জগৎ সংসারের চিরাচরিত নিয়ম। কবির জীবনেও তাই ঘটেছিল। নজরুল সাহেবের অসহায় অবস্থার কথা লোকমুখে জানতে পেরে তাঁকে দেখার জন্য যারপরনাই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কাজী সাহেবের দুঃখ-বেদনা অনুভব করলেন আপন অন্তর দিয়ে। 'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়' —স্বামী বিবেকানন্দের এই শাশ্বত উপলব্ধি মূর্তরূপ পরিগ্রহ করেছিল উদার হৃদয় উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন শ্যামাপ্রসাদের জীবনধর্মে এবং এই বাণীও তাঁকে উৎসাহিত করেছিল মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিরারণে। অধ্যাত্ম মার্গের দিশারি ভারতীয় সাধক বলেন, 'যত্র জীব তত্র শিব।' জীবে প্রেম করে যেইজন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' এইসব চিরন্তন অনুশাসনে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষের ক্লেশ মোচনে ব্রতী হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

সাধক চণ্ডীদাসের অমর বাণী 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' এই অন্তর্বাণীও জনসেবায় উদ্দীপ্ত করেছিল তাঁকে। এবদ্ব্যতীত, শ্রীমদ্ভগবতগীতার পুণ্য শ্লোকে 'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোগর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।'—৬/৩২। পবিত্র গীতার পুণ্যশ্লোকটি উজ্জীবিত করেছিল শ্যামাপ্রসাদকে পরহিতৈষণায়। সকলের দুঃখ-কষ্টকে তিনি নিজের বলে অনুভব করতেন। এবং 'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।' ৬/২৯ শ্রীমদ্ভগবতগীতা।। এই পবিত্র শ্লোকটিও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁর জীবনে। তাই তিনি স্বীয় আত্মায় সর্বভূত এবং সর্বভূতে স্বীয় আত্মাকে অনুভব করতে পারতেন। সকল মানুষে আত্মভাবনা, স্ব-পর রহিত বুদ্ধিতে আপন করে নিতে পারতেন জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বলেও। সকলের সঙ্গেই অভেদ্য ও অভিন্নতা অনুভব করতেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ' মনে করে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রত্যেকের মধ্যেই একই পরমাত্মা বিদ্যমান— 'তৎ সর্বমভবৎ'। সকলেই অমৃতের সন্তান— অমৃতস্য পুত্রাঃ, কেউ পর নয়, বিশ্বের সকলেই আপনজন। 'বিষ্ণুময় জগৎ'। যাঁহা যাঁহা নেত্রে পরে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে। 'ব্রহ্মহতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়, এক ও অভিন্ন আত্মা বিরাজ করছেন সর্বত্র। এটাই কালাতীত সনাতন (হিন্দু) ধর্মের মর্মবাণী। এতে উজ্জীবিত হয়ে সারাজীবন জনসেবা করে গিয়েছেন অবিচারিত চিত্তে শ্যামাপ্রসাদ।

যে মুহূর্তে কাজী সাহেবের অসহায়তার কথা জানতে পারলেন, তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁকে দেখতে যাবার জন্য সহমর্মিতায় ও একাত্মতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। সেই সংকটময় সময়ে অর্থসংকট চলছিল শ্যামাপ্রসাদেরও। অন্যের নিকট হতে পাঁচশো টাকা ধার করলেন একান্ত নিরুপায় হয়ে। সেদিন আবার তাঁর স্বর্গীয় পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাৎসরিক স্মৃতি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বিশিষ্ট জনের অনেকেই উপস্থিত থাকবেন সেই সভায়। পরিবারের একজন বিশিষ্ট সদস্য এবং পিতার অনুগত সন্তান হয়ে ওই সভায় তিনিও থাকবেন এটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। কিন্তু ভিন্ন ধাতুতে গড়া বিরল ও ব্যতিক্রমী মানুষ ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। স্বাতন্ত্র্যবোধে অনন্য ছিলেন তিনি। পারিবারিক অনুষ্ঠানের গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আর্তজনের পাশে দাঁড়ানো অধিক জরুরি মনে করেছিলেন, তাই ছুটে গিয়েছিলেন কবির বাড়িতে। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে বঙ্গ তথা ভারতের স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ নিয়ে নজরুল সাহেবকে মধুপুরে নিজেদের বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন সঙ্গে তাঁর পরিবার-সহ। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ যে কতবড়ো উদার ও মহৎ প্রাণের মানুষ ছিলেন উপরোক্ত ঘটনা তার জ্বলন্ত নিদর্শন।

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন আঁধার ঘরের দীপশিখা। অন্ধকার ঘরের আলোকবর্তিকা। মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার জীবন্ত প্রতীক। সহৃদয়তা ও উপচিকীর্ষা ছিল তাঁর স্বভাবধর্ম। সারাজীবন ধরে মানুষের সেবা করে গিয়েছেন মনপ্রাণ ঢেলে নিঃস্বার্থভাবে। আত্মত্যাগের অমর মহিমায় প্রোজ্জ্বল ছিল তাঁর জীবন। তাঁর গৌরব সূর্যের আলোক ছটায় উদ্ভাসিত হয়েছিল শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারত। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন বঙ্গের অহংকার, ভারতের অলংকার, মানবিকতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন। আত্মত্যাগের অমর মহিমায় প্রোজ্জ্বল ছিল তাঁর মহান জীবন। স্বদেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, অমলিন দেশপ্রেম প্রভৃতি বিরলতম গুণের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ছিলেন তিনি। সমকালীন পেক্ষাপটে এক ও অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন বিরলের মধ্যে বিরলতম। কোটির মধ্যে গুটিক। অনন্যের মধ্যে অন্যতম। শ্যামাপ্রসাদ শুধু ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিরাট প্রতিভার অন্যতম। এই প্রবাদপ্রতিম নির্লিপ্ত জননায়ক তাঁর নির্লোভ জনসেবার আলোকে আপ্লুত ও আকৃষ্ট করেছিলেন দেশবাসীকে। বেঁধে ফেলেছিলেন মমতা ও ভালোবাসার চিরবন্ধনে। নিজেকে তিনি সর্বদা পরিচালিত করতেন স্বার্থহীন পক্ষপাতশূন্য গঠনমূলক চিন্তার দ্বারা। তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী এবং সংবেদনশীল অনুভূতি ছিল অত্যন্ত গভীর। সারা জীবন পরার্থে ব্যাপৃত ছিলেন নীরবে নিভৃতে। তিনি ছিলেন প্রকৃত ধর্মপরায়ণ এবং যথার্থ আত্মিক চেতনায় উদ্ভাসিত।

সে কারণে কোনো সময়েই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় গোড়ামি প্রশ্রয় পেত না তাঁর মন ও মানসে। সর্বশ্রেণীর মানুষের মঙ্গল, সমগ্র দেশের কল্যাণ এবং সর্বসাধারণের হিতসাধনই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান, জীবনব্রত। এই ভাব ও ভাবনায় সর্বদা আত্মসমহিত থাকতেন নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-বিশ্রাম বিসর্জন দিয়ে। সারা জীবন জনসেবায় ব্যাপৃত ছিলেন প্রদীপের

স্নিগ্ধ জ্যোতির মতো। খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সংবেদনশীলতার সমন্বয়ে। সেহেতু সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে আদরণীয়, বরণীয় ও গ্রহণীয় ছিলেন লোকপ্রিয় শ্যামাপ্রসাদ। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর ছিলেন। প্রখর রাজনীতিক অন্তর্দৃষ্টি ও অকপট সমাজ সেবার আলোকে উদ্ভাসিত ছিল তাঁর অন্তরাত্মা। তাঁর মতো উদার অবিচল অসাম্প্রদায়িক মহৎপ্রাণের দেশ নেতার একান্ত প্রয়োজন আজকের নৈতিকতাহীন দ্বিচারিতাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে। তাঁর প্রাসঙ্গিকতা আজও সমভাবে বর্তমান।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন, 'His religion is not of the narrow kind. He is Catholic in his sympathies and broad minded in his outlook.' সাবেক রাষ্ট্রপতির এই মন্তব্য খুবই ইঙ্গিতবহ। প্রণিধানযোগ্য যে, শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদ বর্জিত এবং ধর্মীয় গোড়ামি মুক্ত ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্বন্ধে অবিভক্ত বঙ্গের মুসলিম লিগের অন্যতম নেতা আবুল মনসুর আহমেদের 'স্মৃতি কথা' থেকে কিছুটা তুলে দেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে— 'আমি শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে কয়েকদিন মিশিয়াই বুঝিয়া ছিলাম তাঁর সম্বন্ধে হক সাহেব যাহা বলিয়া ছিলেন তাহা ঠিক। সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে সত্য সত্যই তিনি অনেক কংগ্রেসি নেতার চাইতেও উদার। হিন্দুসভার নেতা হইয়াও কোনো হিন্দু নেতার পক্ষে এমন উদার মনোভাব পোষণ করা সম্ভব, আমার এ অভিজ্ঞতা হইল প্রথম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়া, যিনি দল ও জাত-ধর্মের বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন স্বার্থশূন্য হইয়া। সেই পুণ্যশ্লোক শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন সকল শ্রেণীর জনগণের কাছে অসাম্প্রদায়িক আদর্শের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল প্রদীপ্ত সূর্যের তেজ, অগ্নির প্রভা, নক্ষত্রের স্ফূরণ সত্তা, তেমনি অন্যদিকে ছিল চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ ধারা এবং মাতৃহৃদয়ের কোমল স্পর্শ ও স্বার্থশূন্য ভালোবাসা।'

নানা প্রয়োজনে রাজধানী দিল্লি যেতে হয় অনেক নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালিকে। তন্মধ্যে অনেকেই বাসস্থান আহারাদির ব্যবস্থা করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন বিদেশবিভূঁই অপরিচিত স্থানে আর্থিক সংস্থানের অভাবে। এই বাধা নিরসনের জন্য অনেকে কালীবাড়ি স্থাপন করেন দিল্লিতে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। শ্যামাপ্রসাদ সেখানে নিরাপদ আশ্রয় ও সুষ্ঠু-আহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন স্বল্প মূল্যে। এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন দিল্লিগামী অসংখ্য মানুষ। তাঁর এই অবিস্মরণীয় অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়। শুধু ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকবেন না শ্যামাপ্রসাদ, তিনি স্থায়ীভাবে আসন করে নিয়েছেন মানুষের হৃদয়মন্দিরে। সময় যত অতিবাহিত হচ্ছে ততই দেশবাসীর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা বেড়ে যাচ্ছে তাঁকে কেন্দ্র করে। মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ডভাবে ভারত কেশরীকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য। সাধারণত মৃত্যুর পর অধিকাংশ নেতাই চলে যান বিস্মৃতির অন্তরালে। বিপরীতে, শ্যামাপ্রসাদ চিরস্মরণীয় হয়ে বেঁচে আছেন মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে।

কারণ যথার্থ দেশপ্রেমের রাজনীতিক এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মৃত্যু কখনো হয় না। তাই তিনি মৃত্যুবরণ করেও হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়ী। লাভ করেছেন অমরত্ব। সততা, অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবীয় মূল্যবোধের জাগ্রত প্রতীক ছিলেন তিনি। সকলের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও একাগ্রবোধের ভারতীয় ঐতিহ্যে সঞ্জীবিত ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। একবার বিদেশি ভাবাদর্শের একটি রাজনৈতিক দলের লোকসভার নবনির্বাচিত

নজরুল-শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্ক

ঘরে ক্ষুধার্ত শিশুসন্তান এবং প্যারালাইজড স্ত্রী-কে রেখে গুরুতর অসুস্থ নজরুল পাওনা টাকা চাইতে দ্বারস্থ হন কুলাঙ্গার তথাকথিত শের-এ-বঙ্গ একে ফজলুল হকের কাছে। বন্ধু জুলফিকারকে চিঠিতে নজরুল লেখেন, নবযুগ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে যে সাত হাজার টাকা দেবার কথা ছিল হক সাহেব সাত-আট মাস ঘুরিয়ে তাকে 'কীসের টাকা' বলে ফিরিয়ে দেন। চিঠিতে কবি আরও লেখেন— 'সাত মাস ধরে হক সাহেবের কাছে গিয়ে ভিখারির মতো ৫-৬ ঘণ্টা বসে থেকে ফিরে

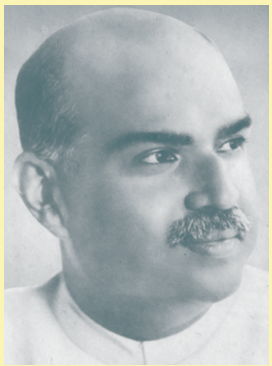

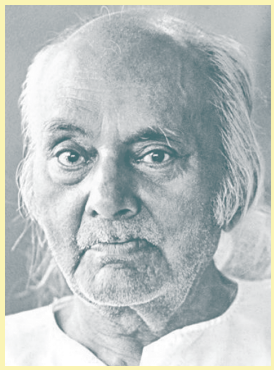

এসেছি। হিন্দু মুসলমান ইকুইটির টাকা কারও বাবার সম্পত্তি নয় যে সেখান থেকে দিবে— আমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অতি কষ্টে দু একটা কথা বলতে পারি।'

এই অবস্থায় স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে নজরুলের যখন গৃহহীন হয়ে পথে বসার অবস্থা, তখন কবিকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন বর্তমান কমরেডদের 'হিন্দুত্ববাদী মুসলমান বিরোধী' হিসেবে আখ্যায়িত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তিনি তার মধুপুরের বাড়িতে নজরুলকে রেখে দেন এবং সেখানে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেন। কৃতজ্ঞ কবি তখন শ্যামাপ্রসাদকে চিঠি লিখে বলেন— 'শ্রীচরণেষু, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। মধুপুর এসে অনেক ভালো অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়তা সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর আসার ব্যবস্থা না করলে হয়তো কবি মধুসূদনের মতো হাসপাতালে আমার মৃত্যু হতো।' (নজরুল ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত নজরুলের পত্রাবলির ৭৯ ও ৮০নং পত্র)।

পরবর্তীতে নজরুল বাক স্মৃতি হারালে শ্যামাপ্রসাদ নজরুলের পরিবারের জন্য 'নজরুল এইড ফান্ড' গঠন করে মাসিক দুশো টাকার ব্যবস্থা করেন যাতে সন্তান-সহ কবি খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারেন। শ্যামাপ্রসাদ ভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের কাছে নজরুলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্নায়ুবিজ্ঞানী ড. গিরীন্দ্রশেখর বসু, ইন্ডিয়ান সাইকোঅ্যানালাইটিক সোসাইটির তৎকালীন সভাপতি। এছাড়া উচ্চতর চিকিৎসার জন্য তিনি নজরুলকে ইউরোপ পাঠাতে চেষ্টা করেন কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে পাঠানো সম্ভব হয়নি। ইতিহাসের এই অংশগুলো সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে পাঠ্যপুস্তকে।

With Best Compliments from

P. C. CHANDRA ® JEWELLERS

A jewel of jewels

pcchandraindia.com | amazon | GET IT ON Google Play Download Now

Follow us on /pcchandrajewellersindia

+918010700400 (Except Sunday)

OUR SHOWROOMS

Bowbazar | Gariahat | Chowringhee | Ultadanga | Golpark | Barasat | Behala | Arambagh
Balurghat | Bankura | Cooch Behar | Katwa | Krishnanagar | Malda | Purulia | Siliguri
Siuri | Tamluk | Agartala

ALL THE BELOW MENTIONED SHOWROOMS WILL REMAIN OPEN ON SUNDAYS

Hatibagan | New Town | Howrah | Serampore | Chandannagar | Sodepur | Habra | Kanchrapara
Baruipur | Barrackpore | Asansol Berhampore | Burdwan | Durgapur | Midnapore | Raiganj | Delhi
Bengaluru (Ulsoor & Koramangala) | Bhubaneswar | Jamshedpur | Noida | Mumbai | Ranchi

সদস্য আইনকানুন, বিধি-বিধান, রীতিনীতি প্রভৃতি সবকিছু ভালোভাবে জেনে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে এসেছিলেন নক্ষত্রখচিত সাংসদ শ্যামাপ্রসাদের কাছে। অথচ, তাদেরই কোনো কোনো নেতা সৌজন্য শালীনতা বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িক, বুর্জোয়া, সামন্ততান্ত্রিকের প্রতিভূ ইত্যাদি আপত্তিকর ভাষায় আক্রমণ করে থাকে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদকে। বিভিন্ন সভা সমাবেশ ও মিছিলে এইভাবে তারা তাঁর নির্মল চরিত্র হননে তৎপর হয়।

প্রতিপক্ষের অশোভন কুরুচিপূর্ণ অসত্য মন্তব্যকে উপেক্ষা করতেন আপন আপন মহত্ত্বে। কমিউনিস্টরা উগ্র সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ মুসলিম লিগকে সমর্থন করে বলেছিল, 'পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে।' পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে জিগির তুলে সরব ও সোচ্চার হয়েছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে জনমত গঠন করতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জনসভা ও দেওয়াল পোস্টারিং করেছিল মুসলিম লিগের দাবিকে জোরদার এবং জিন্নার পাকিস্তান সৃষ্টির স্বপ্নকে সত্বর বাস্তবায়িত করতে। এর অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি ছিল লিগের সাহায্যে বিশাল সমন্বিত ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেশের বৃহত্তর ঐক্য, সংহতি, সৌভ্রাতৃত্বকে ব্যাহত করা এবং সেই সুযোগে বিচ্ছিন্ন অংশগুলিতে নিজেদের দলের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও ভাবাদর্শের প্রচার করা বিদেশি প্রভুদের নির্দেশে। তাদের নিজস্ব নীতি আদর্শ বলে কিছু নেই। তাদের দল চলে প্রধানত বিদেশি শক্তির অঙ্গুলিহেলনে। জাতীয়তাবোধ অপেক্ষা চীন ও রাশিয়া ভক্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য এদের কাছে। বিদেশি পরিচালকদের অন্তঃসারশূন্য আদর্শ, অর্থহীন ভাববাদ এবং কল্পনাপ্রসূত মতবাদের সাহায্যে বিভ্রান্ত বিপথগামী করে থাকে দেশের অধিকাংশ সহজ সরল জনসাধারণকে সুকৌশলে প্রচারের ঢক্কানিনাদে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও এদের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক ও হতাশাব্যঞ্জক।

ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের গোপন তথ্য এরা পাচার করত। স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের ব্রিটিশের হাতে ধরিয়ে দিত। তাদের অকৃত্রিম অনুগামী হয়ে এরাই আবার নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাজাতে স্লোগান দেয় 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্' ইত্যাদি। অবশ্য এ এক খণ্ডচিত্র মাত্র। এদের ইতিহাস নির্লজ্জ দ্বিচারিতা ও আত্মপ্রতারণার। বিদেশি অভিভাবকদের প্রতি এদের অনুরাগ এত বেশি যে তাদের ফোটো ফ্রেমে বাঁধিয়ে দলের বিভিন্ন অফিস ও নিজেদের বাড়িতে রেখে বিদেশি শাসকদের প্রতি অবিচল আনুগত্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। এরা এদের পছন্দমতো বিদেশি শক্তির মতাদর্শে আস্থাবান। এরা স্বদেশের সভ্যতা সংস্কৃতিতে জারিত নয়, গাছের শিকড় বিচ্ছিন্ন হলে যেমন গাছ বাঁচে না তেমনি নিজের দেশের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হলেও জাতীয় জীবনের বিপর্যয় ঘটে। এদেরও সেই অবস্থা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রসচিব ভিপি কৃষ্ণমেনন তাঁর 'Story of the Integrator of the Indian states গ্রন্থে সতর্ক করে বলেছেন, 'যে জাতি তার ইতিহাস-ভূগোল বিস্মৃত হয়, তার বিনাশ আসন্ন।' তাদের কাছে দেশের মনীষী মহাপুরুষেরা ব্রাত্য, অবহেলিত। নানা আপত্তিকর কটূক্তি করে থাকে তাঁদের সম্বন্ধে। দেশের আর্থিক উন্নতিকে অগ্রাহ্য অবজ্ঞা করে। দেশের গৌরব কথায় এরা বিরক্তিবোধ করে।

এরা মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চায় দেশের গৌরবময় অতীতকে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বকে এরা অস্বীকার করে। এরা জানে না যে ভগবানে বিশ্বাস ও আস্থা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে উৎসাহিত করে মানুষকে এবং পরিচ্ছন্ন শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন গঠনে প্রেরণা জোগায় সমাজকে। আত্মসংযমের অভাবে মানুষ পঙ্কিল জীবনে হাবুডুবু খায় এবং ক্রমশ রসাতলে তলিয়ে যায় দিশাহীন হয়ে। বহির্মুখী জীবন বিড়ম্বনা বাড়ায়। অন্তর্মুখীনতা সুস্থ সমাজ গঠনে সাহায্য করে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে অস্বীকার করার ফলে সমাজ জীবনে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে হুশিয়ারি দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'If you take out religion from the society, what will remain ? Nothing but a forest of brutes.'

বিজ্ঞান জগতেও ধর্মহীনতার ক্ষতিকারক পরিণতি সম্বন্ধে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইস্টাইন সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন 'Science without religion is lame and religion without Science is blind.' যদিও বিদেশি ভাবধারার দলটি নিজেদের জনগণের মশীহা ও সুহৃদ বলে জাহির করে থাকে, অথচ কেউ সাহায্যার্থে এদের কাছে এলে দলের প্রতি তাঁর আনুগত্য নিশ্চিত হয়ে তবেই সাহায্য করে থাকে। নতুবা কালির আঁচড় দিয়েও সহযোগিতা করে না বড়ো থেকে চুনোপুঁটি নেতা-নেত্রী পর্যন্ত। এটাই এদের ধারাবাহিকতা। এই দল চলে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও সংকীর্ণ একদেশদর্শিতাকে ভর করে। এদের কাছে নিজের দেশের স্বার্থ গৌণ। দলের স্বার্থই প্রথম ও প্রধান। এরা দলতন্ত্র সর্বস্ব দল। দলতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে এরা বলি দেয় দেশের স্বার্থ।

দেশের মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকে বিদেশি মতাদর্শে বিশ্বাসী দলটি। দলের অনুগতরা আপনজন তাদের, আর অন্যেরা অবজ্ঞেয়। এই বৈষম্য বিভাজন ও সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর। এইরূপ বিভেদকামী দলকে ঘোর সাম্প্রদায়িক দল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বিপরীতে, শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবন ছিল জনমুখী— দলমুখী নন, ভোটসর্বস্ব রাজনীতি তিনি করেননি। নীতি ও আদর্শনির্ভর রাজনীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। তাঁর কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ছিল দেশের স্বার্থ। জীবনের প্রতি মুহূর্তে স্বাধীন ও সামগ্রিক জনকল্যাণমূলক চিন্তার দ্বারা পরিচালনা করতেন নিজেকে। তিনি ছিলেন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশনেতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার পুরোধা পুরুষ। পক্ষপাতশূন্য ভাব ও ভাবনার প্রেরণা স্বরূপ। আপন স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন রাজনীতির বিশাল অঙ্গনে শ্যামাপ্রসাদ।

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ সনাতন হিন্দুধর্মের প্রকৃত অনুগামী ছিলেন বলেই মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্যের ভাব ও ভাবনা ছিল না তাঁর মনে। সকলকেই আপন করে নিতে পারতেন অনায়াসে দলমত বিচার না করে। এটাই ছিল তাঁর মহতী চরিত্রের বিশেষ গুণ। কমিউনিস্টদের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের কর্মপদ্ধতি ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য তো ছিলই না বরং ফারাক ছিল আসমান জমিন। তিনি তাদের সম্বন্ধে সব কিছু জেনেও অতি সহজেই আপন করে নিয়েছিলেন তাঁদের এবং তাঁর জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অকাতরে। পরবর্তীকালে তাদের একজন লোকসভার সাংসদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায়। কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী জেনে শুনে বিজ্ঞতায় অজ্ঞতায়, আবার কেউ-বা অজ্ঞতায় বিজ্ঞতায় স্বকপোলকল্পিত মনগড়া অসত্য অপবাদ প্রচার করে থাকে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে। প্রবাদপ্রতিম সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনপ্রিয় নেতার সম্বন্ধে ভিত্তিহীন বিদ্বেষপূর্ণ বদনাম রটিয়ে নিজেদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয় এরা। জননেতা শ্যামাপ্রসাদের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা, অপরিসীম লোকপ্রিয়তা ও প্রশ্নাতীত গ্রহণযোগ্যতা প্রভৃতি বিরল গুণাবলী গাত্রদাহের কারণ হয় এদের। অথচ এরাই শ্যামাপ্রসাদ সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ক্ষমতা ভোগ করেছে।

শ্যামাপ্রসাদের অবিচল পক্ষপাতহীন অবদান ও ভূমিকা ঈর্ষার সৃষ্টি করে স্বভাব-নিন্দুকদের। তাই অশোভন পথ ও পন্থা অবলম্বন করে তাঁকে হেয় অপদস্ত করতে তৎপর হয় মাৎসর্যপূর্ণ নেতা-নেত্রীরা। ব্যক্তিগতভাবে শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ প্রচার করে জনমানসে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা হানিতে উদ্যোগী হয় পরশ্রীকাতর ব্যক্তিরা বিভ্রান্ত হয়ে। এদের বিদ্বেষপূর্ণ রটনার ধার বা ভার কিছুই নেই। আছে শুধু হীনম্মন্যতার অভিব্যক্তি, অক্ষমের আস্ফালন, দুর্বলের ব্যর্থ আর্তনাদ। এই প্রেক্ষাপটে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত গোস্বামী শ্রীতুলসী দাসের একটি দোঁহা উল্লেখ করা যেতে পারে— 'হাথী চলে বাজার, কুত্তা ভোঁকে হাজার।' □

ছোটোদের শ্যামাপ্রসাদ

তখন তাঁর নাম বেণী। যদিও বেণী নামটি তাঁর পছন্দের ছিল না। কারণ স্কুলে শিশুপাঠ্য গল্পে পড়লেন—'বেণী খুব দুরন্ত ছেলে।' স্কুলের বন্ধুরা তাই তাঁকে রাগাতো, এই সেই দামাল ছেলে, যার নাম বইয়ের পাতায় লেখা আছে।

ব্যাস্, আর যায় কোথায়! বাড়িতে বাবাকে চেপে ধরলে, তাঁর নাম বদলাতেই হবে, কোনো কথা শুনবে না। তাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভাইয়ের প্রসাদ-স্বরূপ বেণীর নতুন নাম হলো 'শ্যামাপ্রসাদ'

যখনকার কথা বলছি, তখন তিনি শিশু বেণী। স্কুলে যাওয়া শুরু হয়নি। বয়স প্রায় দু'বছর । উঠে দাঁড়াতে পারেন না, হাঁটতে তো পারেনই না, কোনোরকমে বসতে পারেন। একটি-দুটি কথা হয়তো বলতে পারেন। কিন্তু সেই বয়স থেকেই বেণী খুব খেতে ভালোবাসেন। নানান খাবারের মধ্যে আম পেলে তো কথাই নেই। গ্রীষ্মের মরসুমে তাকে রসালো মিষ্টি পাকা নরম আম দেওয়া হতো। হাতে রগড়ে ভেতরের শাঁস চুষে খাওয়ার উপযুক্ত করে একটা ফুটো করে নিতেন তিনি।

১৯০১ সালের ৬ জুলাই তাঁর জন্ম। ১৯০৩ সালে আমের মরসুমের কথা। সেদিনও একটা বড়োসড়ো পাকাআম বেণীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাবা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিশাল বপু, তিনি খেতেও ভালোবাসতেন। তবে দুই বছরের শিশুর হাতে এত বড়ো আম দেখে স্ত্রী যোগমায়া দেবীকে একচোট বকে তিনি স্নান করতে চলে গেলেন। শিশু বাবার মুখের দিকে তাকায়, হয়তো মনে মনে ভাবে, তুমি আর আমার কী খবর রাখো!

বাবা আশুতোষ স্নান সেরে বেণীর পাশ দিয়েই ঘরে ঢুকবেন। অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, অতটুকু শিশু আমটি খেয়ে সাবাড় করেছে! আঁটিটিও চেটে চেটে সাদা করে ফেলেছে। এবার আঁটির খোসা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলছে, ওই যাঃ। তারপর আরেকটি আমের জন্য মায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ভাবখানা যেন, আমি রোজ এবেলা-ওবেলা গোটা আম চুষে খাই, আজ আর নতুন কী!

১৯৪৫ সাল নাগাদ শ্যামাপ্রসাদ রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের অনাথ ছাত্রদের কাছে গিয়েছিলেন। পুরনো আশ্রমবাড়ির সামনে প্রাচীন আমগাছের তলায় শামিয়ানা খাটিয়ে কাঠের মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। তখন আমের শেষ মরসুম, বর্ষা শুরু হয়েছে। আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দের নির্দেশে ঠাকুরের ফলপ্রসাদ আর আশ্রমের বাগানের সুস্বাদু আম কেটে তাঁকে পরিবেশন করা হয়। একথা জানিয়েছেন প্রয়াত আশ্রমিক বিধুভূষণ নন্দ।

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

নদ-নদী পরিচয়

গন্ধেশ্বরী নদী

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম সীমানায় কুলুর বাঁধ এলাকা থেকে এই নদীর উৎপত্তি। মুরলু টিলার দক্ষিণ-পশ্চিম ঢালের জল গড়িয়ে এসে কুলুর বাঁধে জমা হয়। সেই জলের স্রোতধারাই গন্ধেশ্বরী নাম নিয়ে শালতোড়া থানার দক্ষিণ দিকে বয়ে এসে শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম হয়ে দক্ষিণ ঢালে বয়ে ছাতনার পাশ দিয়ে বাঁকুড়া শহরকে ছুঁয়ে ভূতেশ্বর গ্রামের পাশে দ্বারকেশ্বর নদে মিলিত হয়েছে। মাত্র ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদী। এই নদীর তীরে শিউলিবনা, ধবন, গোগড়া, আগয়া, কাঁটাবনি, চামকরা, দুলালকুঁড়ি প্রভৃতি গ্রাম। নদীর দুপাশে উঁচু-নীচু রুক্ষ ক্ষেত রয়েছে। গন্ধেশ্বরীর তীরেই বাঁকুড়া শহরের পাঠকপাড়া। এই নদীর জল খুবই দূষিত। কিন্তু বর্ষাকালে সতীঘাট এলাকা প্লাবিত করে।

এসো সংস্কৃত শিখি-২৮

পুস্তকম্- (বইটি)। পুস্তকস্য-(বইটির)

পুস্তকস্য নাম রামায়ণম্ । - পুস্তকস্য নাম কিম্ ?

পুস্তকস্য গীতা। - পুস্তকস্য নাম্ কিম্?

অভ্যাস করি –

ফলম্ –ফলস্য, পুষ্পম্ –পুষ্পস্য, ভবনম্ –ভবনস্য,রাজ্যম–রাজ্যস্য।

অভ্যাস্ করি –

ফলস্য নাম্ কিম্ ? ফলস্য নাম নারিকেলম্ ।

পুষ্পস্য নাম কিম্ ? পুষ্পস্য নাম করবী।

প্রয়োগ করি–

বিঃ দ্রঃ – ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গে শদের সঙ্গে য্যাঃ /য্যা: হবে।

ভালো কথা

বুধুর শালিক ছানা

গরমের জন্য তখন আমাদের স্কুল সকালে হচ্ছিল। আমি আর বুধু (বুদ্ধেশ্বর) একদিন আগে স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখি একটি বটগাছের তলায় দুটো শালিক ছানা ঘাসের উপর পড়ে আছে। ছানা দুটোর কাছে যেতেই হাঁ করে চিঁ চিঁ করছে। খুবই ছোটো। বুধু ছানা দুটেকে হাতে নিয়ে বলল, আমি বাড়ি নিয়ে যাব। আমি এক সপ্তাহ পরে ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি ছানা দুটো বড়ো হয়েছে। সারা গায়ে পালকে ভরে গেছে। বুধু আর আমি ওদের কাছে যেতেই ওরা হাঁ করে চিঁ চিঁ করছে আর বুধু রুটির টুকরো ওদের মুখে ধরিয়ে দিচ্ছে। আমিও দুটোর মুখেই রুটির টুকরো দিলাম। আবার সাতদিন পরে গিয়ে দেখি, ছানাদুটো বুধুর মাথায়, ঘাড়ে বসে আছে। আর বুধু ওদের নিয়ে উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কাছে যেতেই ওরা উড়ে ঘরের চালে গিয়ে বসল। বুধু মুখে একটা শিস দিতেই ওরা আবার বুধুর মাথায় ওসে বসল।

শ্রবণ কুমার মাহাত, চতুর্থশ্রেণী, রানিবাঁধ, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ধ না সা গ	(১) ক সা পো জ শা
(২) ন ভ জ ব	(২) ল ত স সা কা

১৭ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) উচ্চশিক্ষিত (২) উচ্চাভিলাষ

১৭ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) ভাগ্যবিধাতা (২) ভারতমাতা

উত্তরদাতার নাম

(১) সপ্তর্ষি রায়, লেক টাউন, কল-৪৮। (২) তরুণ কুমার মার্ডি, গড়িয়া, কল-৮৪। (৩) শ্রেয়সী ঘোষ, ই বি মালদা, (৪) দেবরূপা কর্মকার, গড়িয়া, কল-৮৪।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছে বাঙ্গালি

কানু রঞ্জন দেবনাথ

ড. শ্যামাপ্রসাদ মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কনিষ্ঠ ভাইস চ্যান্সেলার বা উপাচার্য হয়েছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার বা উপাচার্য দুইবার মনোনীত হন। তাঁর মেয়াদকাল ছিল ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত।

সেই সময়ে বঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতিতে এক কঠিন সময় চলছিল। জিন্নার মুসলিম লিগ দল বঙ্গে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিল। মুসলিম লিগ যতই শক্তিশালী হচ্ছিল, ততই ইংরেজদের সঙ্গে মিলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছিল এবং এতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নষ্টের দিকে যাচ্ছিল। ফলে বঙ্গের হিন্দু সমাজ ও হিন্দু নেতৃত্ব বুঝতে পারলেন বাঙ্গালি হিন্দুদের দুর্দশার দিন আসতে চলেছে। সকলে মিলে শ্যামাপ্রসাদকে শিক্ষাক্ষেত্র ছেড়ে রাজনীতির জগতে প্রবেশ করার আবেদন জানালেন।

হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিপদের ঘণ্টাধ্বনি শুনে তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। তাই তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ও মুসলিম লিগের পরিকল্পিত আক্রমণের বিরুদ্ধে রণনীতি তৈরি করেছিলেন।

রাজনীতিতে এসে তিনি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। বঙ্গের কংগ্রেস শক্তিশালী ছিল; কিন্তু হিন্দুদের পক্ষে কখনো কিছু বলতো না। মুসলিম লিগের প্রবল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সামনে কংগ্রেস নীরব, নতজানু অবস্থায় ছিল। বঙ্গের কমিউনিস্টরা মুসলিম লিগকেই সমর্থনতো করতো, অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার মতো দল যারা হিন্দুদের হয়ে কথা বলতো তাদের 'সাম্প্রদায়িক', 'বিভেদকামী' ইত্যাদি বলে গালি দিত। বলাবাহুল্য আজও কংগ্রেস, কমিউনিস্টদের চরিত্র সেদিনের মতোই রয়ে গেছে। ৭৭ বছর পরেও আজকাল কংগ্রেস, কমিউনিস্টরা কট্টর মুসলমান সাম্প্রদায়িক আব্বাস ভাইয়ের বা নওশাদ সিদ্দিকির দল 'আইএসএফ' দলের সঙ্গে জোট করার জন্য পাগল হয়ে থাকে। অন্যদিকে বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক, অসভ্য, দাঙ্গাবাজের দল বলে প্রচার করে থাকে। সেদিনের সেই কঠিন সময়ে যারা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন এনসি চ্যাটার্জি (প্রাক্তন প্রয়াত লোকসভার অধ্যক্ষ সোমনাথ চ্যাটার্জির পিতা), আশুতোষ লাহিড়ী, জাস্টিস মন্মথ নাথ মুখার্জি এবং হিন্দু মিলন মন্দির তথা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ।

হিন্দু মিলন মন্দির তথা 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সখ্য ছিল। স্বামীজী মহাপ্রয়াণ বা দেহত্যাগ করার আগে বাঙ্গালি হিন্দুদের দায়িত্ব ড. মুখার্জিকে দিয়ে যান। তাঁর হাতে বাঙ্গালি হিন্দুদের ভার দেওয়ার জন্য ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে কাশীধামে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দুর্গাপূজার উৎসব-সম্মেলনের কয়েকদিন আগে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ তাঁর সঙ্ঘ সন্তানদের বললেন, 'শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে এস'। শিষ্যরা জিজ্ঞেস করলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ কি এখন কাশীতে এসেছেন?' আচার্যদেব বললেন, 'হ্যাঁ, এসেছে, খুঁজে দেখ।' শিষ্যরা খোঁজ করতে করতে দেখলেন মুখার্জি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সপরিবার অবস্থান করছেন। সন্ন্যাসীরা গিয়ে তাঁকে (মুখার্জিকে) বললেন, 'স্বামীজী মহারাজ আপনাকে স্মরণ করছেন। চলুন একবার আমাদের আশ্রমে।' শ্যামাপ্রসাদ বললেন, 'মহাষ্টমীর প্রাতে আমরা সকালে মায়ের আশ্রমে গিয়ে মায়ের চরণে অঞ্জলি দেব, স্বামীজী মহারাজের দর্শন করব, আশীর্বাদ নেব।' মহাষ্টমীর দিন সপরিবার সকলে শ্যামাপ্রসাদ এলেন। মহামায়ার চরণে অঞ্জলি নিবেদনপূর্বক মুখার্জি একাকী প্রণবানন্দজী স্বামী মহারাজের কক্ষে প্রবেশ করলেন। স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ নিজের গলার মালাটি খুলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'শ্যামাবাবু, হিন্দুর আজ বড়ো দুর্দিন। আপনাকেই তাদের রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে।' স্বামীজীর কাছ থেকে শ্যামাপ্রসাদ

LUXMI TEA CO. PRIVATE LIMITED

17, R. N. Mukherjee Road, Kishore Bhawan, Kolkata-700 001
Phone No. 2248 4437/4227, Fax No. 2243 0177
E-mail : pulakchow01@gmail.com Web.: www.luxmigroup.in

GROUP GARDENS

NARAYANPUR T.E.
SHYAMGURI T.E.
MONMOHINIPUR T.E.
MANOBAG T.E.
BHUYANKHAT T.E.
MANU VALLEY T.E.
GOLOKPUR T.E.
PEARACHERRA T.E.
JAGANNATHPUR T.E.
SAROJINI T.E.
FULBARI T.E.
URRUNABUND T.E.
MAKAIBARI T.E.
KENDUGURI T.E.
MORAN T.E.
SEPON T.E.
ATTABARIE T.E.
LEPTKATTA T.E.
ADDABARI T.E.
DIRAI T.E.
MAHAKALI T.E.

SHREE JAIN VIDYALAYA

Educational institution in Howrah, West Bengal

Address

25/1, Bonbehari Bose Road, Sandhya Bazar,
Choura Bustee, Shibpur, Howrah, West Bengal- 711101
Phone - 033-22426369

যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁকে যারা সেইসময় দেখেছেন তারা শ্যামাপ্রসাদজীর চোখ মুখ দেখে এক অন্য শ্যামাপ্রসাদকে যেন দেখতে পেলেন। শ্যামাপ্রসাদ যেন এক অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করেছেন।

তেজোব্যঞ্জক পৌরুষ ও প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির সমন্বয়ে গঠিত সেই বিরাট পুরুষের কাছ থেকে পাওয়া দায়িত্ব সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় সচেতন। সেইজন্য তিনি হিন্দু বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে মরিয়া হয়ে মাঠে নেমেছিলেন হিন্দু বাঙ্গালির হোমল্যান্ডের জন্য। সফলও হয়েছিলেন। ভীতু হিন্দু বাঙ্গালির শিরায় শিরায় যুদ্ধের বাজনা বাজিয়ে পাকিস্তানের কবলে প্রায় চলে যাওয়া গোটা বঙ্গ থেকে পশ্চিম অংশকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য হিসেবে 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক রাজ্যের জন্ম হয়েছিল বাঙ্গালি হিন্দুর আশ্রয়স্থল হিসেবে ২০ জুন।

কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ নীতি দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে কংগ্রেসে থাকলে তিনি হিন্দুর জন্য কিছুই করতে পারবেন না, তাকে প্রতি পদে পদে বাধা পেতে হবে। তাই তিনি বাধ্য হয়ে ১৯৪০ সালে প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরের হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। জিন্নার মুসলিম লিগ ভারত ভাগ করে মুসলমানদের জন্য আলাদা পাকিস্তান সৃষ্টি করতে চাইলে দিকে ড. মুখার্জি ভারত ভাগের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৪১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি বলেন, 'যদি মুসলমানরা ভারতবর্ষের বিভাজন চায়, তবে ভারতের সকল মুসলমানের উচিত তাদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে পাকিস্তানে চলে যাওয়া।'

এরপর ১৯৪৭ সালের ৩ জুন কংগ্রেসের জওহরলাল নেহরুর সাহায্যে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ভারত ভাগের ঘোষণা করে দেন। কিন্তু ঘোষণামতো বঙ্গ (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ) এবং পঞ্জাবপ্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপরেই ড. মুখার্জি বঙ্গের সমস্ত প্রান্ত থেকে হিন্দু প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বসম্মতিতে একটি প্রস্তাব পাশ করেন, তাতে বলা হয়, 'বঙ্গের হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলিকে নিয়ে আলাদা একটি রাজ্য গঠন করা হোক'। এই প্রতিনিধি সম্মেলনে ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি, লর্ড সিনহা, সুপ্রসিদ্ধ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ।

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, যে বাঙ্গালি হিন্দু সমাজের জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তৎকালীন ইংরেজ সরকার, জিন্নার মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের জওহরলাল নেহরুদের বিরুদ্ধে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গকে মুসলমানদের জন্য গড়া পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) প্রায় চলে যাওয়া থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন, সেই বাঙ্গালি হিন্দু সমাজই এতকাল ধরে শ্যামাপ্রসাদজীকে অচ্ছুত করে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এরাজ্যের কংগ্রেস, কমিউনিস্টরা আজও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে 'সাম্প্রদায়িক', 'অচ্ছুত', 'বর্বর' বলে সবচেয়ে বেশি গালিগালাজ দিয়ে চলেছে।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যারা ধর্ম রক্ষার জন্য ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছে বা শ্যামাপ্রসাদের জন্য তৈরি হওয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়ে নিশ্চিন্তে ধর্মরক্ষা করে পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করছেন, এখানে মানে ভারতে আসার পর তারাই সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ সেজে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে যারপরনাই বকে চলেছে। তারা এটা চিন্তাও করে না যে যাঁকে তারা গালিগালাজ করছেন তিনি যদি সেই সময় হিন্দুদের জন্য লড়াই করে পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানে প্রায় চলে যাওয়া থেকে ছিনিয়ে না আনতেন, তাহলে আজকে পশ্চিমবঙ্গ নামে কোনো রাজ্যই ভারতে থাকতো না। এই পশ্চিমবঙ্গ জায়গাটাও পাকিস্তানের অংশ হয়ে যেত বা বর্তমানে বাংলাদেশের অংশ হতো।

পশ্চিমবঙ্গে একটা প্রবাদ আছে, 'যার জন্য করলাম চুরি, সেই বলে চোর।' ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যে হিন্দু বাঙ্গালির নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, জান ও জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে লড়াই করে বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য নিরাপদ বাসভূমি জোগাড় করে দিলেন,—সেই বাঙ্গালি হিন্দুরাই সবচেয়ে বেশি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে সাম্প্রদায়িক, দাঙ্গাকারী বলে গালি দিয়েছে! শ্যামাপ্রসাদের প্রতি বাঙ্গালি হিন্দুর এই কৃতজ্ঞতা! শ্যামাপ্রসাদের হাতে তৈরি বিজেপি (পূর্ব নাম জনসঙ্ঘ) দলকেই হিন্দুরা এতকাল অচ্ছুত করে রেখেছিল। এই লোকসভার নির্বাচনেও শ্যামাপ্রসাদের জন্মভূমি বা শ্যামাপ্রসাদের সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুরা বিজেপিকে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় যে ভোট দিয়েছিল তার থেকে আরও কম আসন পেয়েছে।

গোটা পশ্চিমবঙ্গ-সহ সম্পূর্ণ বঙ্গকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে না পেরে পরাজিত জিন্না মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে বিলাপ করে বলেছিল, 'কলকাতা ছাড়া এই পোকায় কাটা, ('মথ-ইটেন') বঙ্গকে নিয়ে আমি করবো কী?' মাউন্টব্যাটেন তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি যে ভাষা বোঝেন, সেই ভাষাতেই তাকে জবাব ফিরিয়ে দিয়েছেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। বঙ্গে প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে একটা কমিটি গঠন করলো বঙ্গ ভাগের বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য। নির্ণায়ক দিনটি ছিল ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসের ৪, ৫ ও ৬ তারিখ। হুগলির তারকেশ্বরে সমগ্র বঙ্গ থেকে ৪০০ জন বাছাই করা প্রতিনিধি নিয়ে শুরু হয় তিনদিনের প্রাদেশিক হিন্দুসভার বৈঠক। উদ্দেশ্য, বাঙ্গালি হিন্দুর নিজস্ব বাসভূমি আদায়। ড. মুখার্জির উপস্থিতিতে প্রস্তাব

পাশ হলো বঙ্গ ভাগের বিপক্ষে।

তারকেশ্বরের সভায় প্রাক্তন লোকসভার স্পিকার সিপিএম-এর সোমনাথ চ্যাটার্জির পিতা নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জি বললেন, 'বাঙ্গালি হিন্দু জাতীয়তাবোধের স্বার্থে এবং বাঙ্গালি হিন্দুর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বঙ্গপ্রদেশের বিভাজন করতেই হবে।' তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে তৎকালীন সময় পর্যন্ত বঙ্গের ঘটনাবলী ও ইতিহাসের বিশ্লেষণ করে বললেন, 'মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দুরা জীবন, ধর্ম, সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না।'

৫ এপ্রিল ১৯৪৭ সালে, নিজের ভাষণে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বললেন, 'বাঙ্গালি হিন্দুর সামনে একমাত্র পথ বঙ্গ বিভাজন। গোটা বঙ্গ পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিকে ঠেকাতে মরণপণ করে হিন্দু বাঙ্গালিকে মাঠে নামতে হবে'। শেষদিনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে দুই প্রখ্যাত বাঙ্গালি ব্যক্তিত্ব সনৎ কুমার রায়চৌধুরী এবং সূর্য কুমার বোস আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গবিভাজনের প্রস্তাব রাখেন। সর্বসম্মতভাবে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি এবং তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করা হলো এক সিংহসম ব্যক্তি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কাঁধে। বঙ্গের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীরা একত্রিতভাবে তাঁর নেতৃত্বের উপর আস্থা ব্যক্ত করলেন। উল্লেখ্য যে, সেই সময়ের কলকাতার বাঙ্গালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন দেশপ্রেমী, ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় কৃষ্টিপ্রেমী। তাঁরা আজকের বঙ্গের অধিকাংশ তথাকথিত বিদেশি ভাবধারায় ভাবান্বিত এবং বিদেশি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নামধারী বুদ্ধিজীবী ছিলেন না, যারা হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির এবং ভারতীয় কৃষ্টির ঘোর বিদ্বেষী বা ঘোর বিরোধী। 'কাউন্সিল অব অ্যাকশন' তিনি ঠিক করলেন। নিশ্চয় তখন তাঁর মানস চক্ষে ভেসে উঠেছিল এক সন্ন্যাসীর প্রতিচ্ছবি। কানের কাছে ধ্বনিত হচ্ছিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তথা হিন্দু মিলন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের উক্তি, 'বঙ্গের হিন্দুদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।'

বাঙ্গালি হিন্দু সমাজের কাছে ড. মুখার্জি আহ্বান রাখলেন, 'উই শ্যাল হ্যাভ আওয়ার হোমল্যান্ড, লেট দিস বি আওয়ার মোটো। নাউ অর নেভার। লেট দিস বি আওয়ার স্লোগান'। ড. মুখার্জির নেতৃত্বে বাঙ্গালি হিন্দুরা মাঠে নামলো। মুসলিম লিগের স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে নিজেদের হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ ছিনিয়ে আনলো। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে ৫৮-২১ ভোটে হিন্দু প্রধান এই পশ্চিম অংশের প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি এবং তার ভারতে থাকা সুনিশ্চিত করলেন। নিশ্চয় সেদিন শ্যামাপ্রসাদের শিরে সেই তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই ঐতিহাসিক সত্যটা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকদল, কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা অস্বীকার করে চলেছে। □

With Best Compliments from -

A

Well wisher

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শক্তিপীঠ

মা কামাখ্যা

গিরিরাজ দে

কামাখ্যা মন্দির (অসমীয়া : কামাখ্যা মন্দিৰ) হলো ভারতের অসম রাজ্যের গুয়াহাটি শহরের পশ্চিমাংশে নীলাচল পর্বতে অবস্থিত হিন্দু দেবী কামাখ্যার একটি মন্দির। এটি ৫১ সতীপীঠের অন্যতম। এই মন্দির চত্বরে দশমহাবিদ্যার মন্দিরও আছে। এই মন্দিরগুলিতে দশমহাবিদ্যা অর্থাৎ ভুবনেশ্বরী, বগলামুখী, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরাসুন্দরী, তারা, কালী, ভৈরবী, ধূমাবতী, মাতঙ্গী ও কমলা— এই দশ দেবীর মন্দিরও রয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী, মাতঙ্গী ও কমলা প্রধান মন্দিরে পূজিত হন। অন্যান্য দেবীদের জন্য পৃথক মন্দির আছে। হিন্দুদের, বিশেষত তন্ত্রসাধকদের কাছে এই মন্দির একটি পবিত্র তীর্থ।

কামাখ্যা মন্দির

কামাখ্যা মন্দিরে চারটি কক্ষ আছে, গর্ভগৃহ ও তিনটি মণ্ডপ (যেগুলির স্থানীয় নাম চলন্ত, পঞ্চরত্ন ও নাটমন্দির)। গর্ভগৃহটি পঞ্চরথ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। অন্যগুলির স্থাপত্য তেজপুরের সূর্যমন্দিরের সমতুল্য। এগুলিতে খাজুরাহো বা অন্যান্য মধ্যভারতীয় মন্দিরের আদলে নির্মিত খোদাইচিত্র দেখা যায়। মন্দিরের চূড়াগুলি মৌচাকের মতো দেখতে। নিম্ন অসমের বহু মন্দিরে এই ধরনের চূড়া দেখা যায়। গর্ভগৃহটি আসলে ভূগর্ভস্থ একটি গুহা। এখানে কোনো মূর্তি নেই। শুধু একটি পাথরের সরু গর্ত দেখা যায়।

গর্ভগৃহটি ছোটো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সরু খাড়াই সিঁড়ি পেরিয়ে এখানে পৌঁছাতে হয়। ভিতরে ঢালু পাথরের একটি খণ্ড আছে যেটি যোনি আকৃতিবিশিষ্ট। এটিতে প্রায় দশ ইঞ্চি গভীর একটি গর্ত দেখা যায়। একটি ভূগর্ভস্থ প্রস্রবণের জল পেরিয়ে এই গর্তটি সবসময় ভর্তি রাখে। এই গর্তটিই দেবী কামাখ্যা নামে পূজিতা এবং দেবী পীঠ হিসেবে প্রসিদ্ধ। কামাখ্যা মন্দির চত্বরের অন্যান্য মন্দিরগুলিতেই একই রকম যোনি-আকৃতিবিশিষ্ট পাথর দেখা যায়, যা ভূগর্ভস্থ প্রস্রবণের জল দ্বারা পূর্ণ থাকে।

কামাখ্যা মন্দিরের অধিষ্ঠান : এটির থেকে অনুমিত হয় মূল মন্দিরটি নাগারা স্থাপত্যশৈলীর মন্দির ছিল। অসমে এই ধরনের শিখর বা চূড়া অনেক মন্দিরেই দেখা যায়। এর চারপাশে বঙ্গীয় চারচালা স্থাপত্যে অঙ্গশিখর থাকে। অন্তরাল নামে এক ধরনের স্থাপত্য দেখা যায়, যা আটচালা স্থাপত্যের অনুরূপ। বর্তমান মন্দির ভবনটি অহোম রাজাদের রাজত্বকালে নির্মিত। এর মধ্যে প্রাচীন কোচ স্থাপত্যটি সযত্নে রক্ষিত। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ১৫৬৫ নাগাদ কোচরাজা চিলারায় মধ্যযুগীয় মন্দিরের স্থাপত্যরীতি অনুসারে মন্দিরটি পুনরায় নির্মাণ করে দেন। এখন যে মৌচাক-আকারের চূড়াটি দেখা যায়, তা নিম্ন অসমের মন্দির স্থাপত্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মন্দিরের বাইরে গণেশ ও অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত আছে। মন্দিরের তিনটি প্রধান কক্ষ। পশ্চিমের কক্ষটি বৃহৎ ও আয়তাকার। সাধারণ তীর্থযাত্রীরা এটি পূজার জন্য ব্যবহার করেন না। মাঝের কক্ষটি বর্গাকার। এখানে দেবীর একটি ছোটো মূর্তি আছে। এই মূর্তিটি পরবর্তীকালে এখানে স্থাপিত হয়। এই কক্ষের দেওয়ালে নরনারায়ণ, অন্যান্য দেব-দেবী ও তৎসম্পর্কিত শিলালেখ খোদিত আছে। মাঝের কক্ষটি দিয়ে মূল গর্ভগৃহে যাওয়া যায়। এটি গুহার আকৃতিবিশিষ্ট। এখানে কোনো মূর্তি নেই। শুধু যোনি-আকৃতিবিশিষ্ট পাথর ও ভূগর্ভস্থ প্রস্রবনটি আছে। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে অম্বুবাচী মেলার সময় কামাখ্যা দেবীর ঋতুমতী হওয়ার ঘটনাকে উদযাপন করা হয়। এই সময় মূল গর্ভগৃহের প্রস্রবণের

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

জল আয়রন অক্সাইডের প্রভাবে লাল হয়ে থাকে। ফলে এটিকে রক্তের মতো দেখতে হয়।

ইতিহাস

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের বর্মণ রাজবংশের শাসনকালে (৩৫০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ) এবং সপ্তম শতাব্দীর চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙের রচনাতেও কামাখ্যা উপেক্ষিত হয়েছে। সেই সময় কামাখ্যাকে অব্রাহ্মণ কিরাত জাতীয় উপাস্য দেবী মনে করা হতো। নবম শতাব্দীতে ম্লেচ্ছ রাজবংশের বানমল বর্মদেবের তেজপুর লিপিতে প্রথম কামাখ্যার শিলালিপির-উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে এখানে একটি বিশাল মন্দির ছিল। জনশ্রুতি অনুসারে, সুলেমান কিরানির (১৫৬৬-১৫৭২) সেনাপতি কালাপাহাড় এই মন্দির ধ্বংস করেছিল। তবে ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কামতা রাজ্য আক্রমণ করার সময় (১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ) এই মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কথিত আছে, কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ এই ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পান। তিনিই এই মন্দিরে পূজার পুন:প্রবর্তন করেন। তবে তাঁর পুত্র নরনারায়ণের রাজত্বকালে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়। পুনর্নির্মাণের সময় পুরনো মন্দিরের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছিল। পরে অহোম রাজ্যের রাজারা এই মন্দিরটি আরও বড়ো করে তোলেন। অন্যান্য মন্দিরগুলি পরে নির্মিত হয়।

অহোম রাজত্বে কামাখ্যা

জনশ্রুতি অনুসারে কোচবিহার রাজপরিবারকে দেবী কামাখ্যাই পূজার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। কোচবিহার রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন এই মন্দির পরিচালনা কষ্টকর হয়ে ওঠে। ১৬৫৮ সালে অহোম রাজা জয়ধ্বজ সিংহ নিম্ন অসম জয় করলে এই মন্দির সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। অহোম রাজারা শাক্ত বা শৈব ধর্মাবলম্বী হতেন। তাঁরাই এই মন্দির সংস্কার ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব নিতেন।

রুদ্র সিংহ (রাজত্বকাল ১৬৯৬-১৭১৪) বৃদ্ধবয়সে গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রজার কাছে মাথানত করতে পারবেন না বলে তিনি বঙ্গপ্রদেশে দূত পাঠালেন। নদীয়া জেলার শান্তিপুরের কাছে মালিপোতার বিশিষ্ট শাক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্যকে তিনি অসমে আসার অনুরোধ জানালেন। কৃষ্ণরাম জানালেন, কামাখ্যা মন্দিরের দায়িত্ব দিলে, তবেই তিনি অসম যাবেন। রাজা নিজে দীক্ষা না নিলেও, তাঁর পুত্রদের ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণরামের কাছে দীক্ষা নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

রুদ্র সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শিব সিংহ (রাজত্বকাল ১৭১৪-১৭৪৪) রাজা হন। তিনি কামাখ্যা মন্দির ও পার্শ্ববর্তী বিরাট একটি ভূখণ্ড কৃষ্ণরামকে দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে দান করেন। তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের পর্বতীয়া গোঁসাই বলা হতো। কারণ তাঁরা নীলাচল পর্বতের উপর থাকতেন। কামাখ্যা মন্দিরের অনেক পুরোহিত ও অসমের অনেক আধুনিক শাক্ত এই পর্বতীয়া গোঁসাইদের শিষ্য।

মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য

অনুমত, প্রাচীনকালে কামাখ্যা ছিল খাসি উপজাতিদের বলিদানের জায়গা। এখনও বলিদান এখানে পূজার অঙ্গ। এখানে অনেক ভক্তই দেবীর উদ্দেশ্যে ছাগলবলি দেন।

কালিকা পুরাণ অনুসারে, কামাখ্যায় পূজা করলে সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয়। মোক্ষদাত্রী শক্তিই কামাখ্যা নামে পরিচিত।

দ্বাদশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নীলাচল পর্বতে মোঙ্গলরা আক্রমণ করলে প্রথম তান্ত্রিক কামাখ্যা মন্দিরটি ধ্বংস হয়েছিল। দ্বিতীয় তান্ত্রিক মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল মুসলমান আক্রমণের সময়। অসমের অন্যান্য দেবীদের মতো, দেবী কামাখ্যার পূজাতেও আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। দেবীকে যেসব নামে পূজা করা হয় তার মধ্যে অনেক স্থানীয় আর্য ও অনার্য দেব-দেবীর নাম আছে। যোগিনী তন্ত্র অনুসারে, এই যোগিনী পীঠের ধর্মের উৎস কিরাত-ধর্ম। বাণীকান্ত কাকতির মতে, গারো উপজাতির মানুষেরা কামাখ্যায় শূকর বলি দিত। এই প্রথা নরনারায়ণ-কর্তৃক নিযুক্ত পুরোহিতদের মধ্যেও দেখা যেত।

কামাখ্যার পূজা বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয় মতেই হয়। সাধারণত ফুল দিয়েই পূজা দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে পশুবলি হয়। স্ত্রীপশু বলি সাধারণত নিষিদ্ধ হলেও, বহু পশুবলির ক্ষেত্রে এই নিয়মে ছাড় দেওয়া হয়।

কিংবদন্তী

বারাণসীর বৈদিক ঋষি বাৎস্যায়ন খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নেপালের রাজার দ্বারস্থ হয়ে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করে তাদের নরবলি প্রথার গ্রহণযোগ্য বিকল্প চালু করার জন্য অনুরোধ করেন। বাৎস্যায়নের মতে, পূর্ব হিমালয়ের গারো পাহাড়ে তারা দেবীর তান্ত্রিক পূজা প্রচলিত ছিল। সেখানে জনজাতিরা দেবীর যোনিকে 'কামাকি' নামে পূজা করত। ব্রাহ্মণ্যযুগে কালিকাপুরাণে সব দেবীকেই মহাশক্তির অংশ বলা হয়েছে। সেই হিসেবে, কামাখ্যাও মহাশক্তির অংশ হিসেবে পূজিত হন।

কালিকা পুরাণের মতে, কামাখ্যা মন্দিরে সতী শিবের সঙ্গে বিহার করেন। এখানে মা সতীর মাতৃঅঙ্গ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। দেবীভাগবত পুরাণের ১০৮ পীঠের তালিকায় যদিও এই তীর্থের নাম নেই। তবে অপর একটি তালিকায় কামাখ্যা নাম পাওয়া যায়। যোগিনী তন্ত্রে অবশ্য কালিকা পুরাণের মতকে অগ্রাহ্য করে 'কামাখ্যা কালী' বলা হয়েছে এবং যোনির প্রতীকতত্ত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। □

CAPITAL TRANSPORT CORPN. OF INDIA

H.O.

25, Gangadhar Babu Lane, Kolkata - 700 012 Phone : 2215-4312, 2236-0713

Branches:

Aligarh l Mumbai * Delhi l Durgapur * Hyderabad l Chennai * Vezianagaram

BRITANNIA GLASS CO.

7, Swallow Lane, Kolkata - 700 001, (W. B.) India

Ph. - 0091-33-2210 4275 / 2230 5837 / 4064 5951

E-mail : gautam.ge@mail.com

britanniaglass@rediffmail.com

With Best Compliments from-

B.J.P. Ex-vice President

PIYUSH KANODIA

Kolkata North
Subarban District

With Best Compliments from -

A

Well wisher